চলচ্চিত্র

ভূমিকা

এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট আঠারোটি প্রবন্ধের মধ্যে কেবলমাত্র দুটিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত রচনা বলা চলে। দুটিই আমার ছবির বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদে লেখা। অবশিষ্ট রচনাগুলির অধিকাংশ 'দেশ'-পত্রিকার বাৎসরিক উপরোধের পরিণাম।

স্বভাবতঃই এইসব ইতস্ততঃ রচনা থেকে চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে, বা চলচ্চিত্রশিল্পী হিসাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশদ ধারণালাভ সম্ভব নয়। সাহিত্য নাটক চিত্রকলা সংগীত ইত্যাদির প্রভাব সত্ত্বেও যে চলচ্চিত্রশিল্প নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর, এবং এই শিল্পের গুণাগুণ বিচারে যে এক বিশেষ ধরনের সমঝদারির প্রয়োজন, এই দুটি মূল ধারণা এই লেখাগুলির সাহায্যে পাঠকমনে সঞ্চারিত হলেই মনে করব এই সংকলন অনেকাংশে সার্থক।

সংকলনের পরিকল্পনা প্রকাশকের। রচনাগুলি একত্র করার দায়িত্বও তাঁরাই বহন করেছেন। সুতরাং ধন্যবাদের সবটুকুই তাঁদেরই প্রাপ্য।

pathagar.net

সূচীপত্র

pathagar.net

চলচ্চিত্রের ভাষা : সেকাল ও একাল

আজকাল বিদেশের অনেক ছায়াচিত্রে একটা নতুনত্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেটা সম্বন্ধে এ দেশেও অনেকেই সচেতন হয়ে পড়েছেন। এই নতুনত্বের একটা দিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। মানব-জীবন ও মানব-সমাজের অনেক ঘটনা, অনেক সমস্যা আজকাল ছবিতে স্থান পাচ্ছে যেগুলো কিছুদিন আগে পর্যন্ত হয় 'লোকে-নেবেনা' না হয় 'ছবিতে-চলেনা'র পর্যায়ভুক্ত ছিল। স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের বর্ণনা শিল্প-সাহিত্যে নতুন কিছু না হলেও সিনেমায় এটা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আজকাল কেউ যদি বিদেশের কোনো চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে ছবি দেখেন, তাহলে তাঁর এমনও মনে হতে পারে যে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কই বুঝি আধুনিক চলচ্চিত্রের একমাত্র বিষয়বস্তু।

নতুনত্বের অন্য—এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ—দিকটা হল ভাষাগত। এর আগেও যে কখনো ছবির ভাষায় কোন পরিবর্তন হয়নি তা নয়। ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকের যে কোন আমেরিকান ছবির সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের কোন ছবির তুলনা করলেই ভাষার পার্থক্য ধরা পড়বে। কিন্তু এ পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম—কাজেই সেটা চট করে চোখে পড়ার মত কিছু নয়। কিন্তু আজ যে নতুন ভঙ্গিটা সিনেমায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা অনেক সময়ই মনে হয় যেন একটা আস্ফালনের ভঙ্গি ; তাতে চমক লাগানোর প্রয়াসটা বেশ স্পষ্ট। আর পার্থক্যটা এত স্পষ্ট বলেই হয়ত তার প্রভাব এত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের বহু তরুণ পরিচালকেরা এই নতুন বুলি আওড়াচ্ছেন। বার বার দর্শকদের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, এবং চিত্রসমালোচকদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছেন। এই সব সমালোচকদেরই মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, এই নতুন ভাষাই হল আজকের চলচ্চিত্রের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা ; এই ভাষা যে ছবিতে ব্যবহার হল না, সে ছবি যুগোপযোগী শিল্প-সৃষ্টির পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য নয়।

ব্যাপার গুরুতর, এবং গুরুতর এই কারণেই যে, এ যুগটা হল হুজুগের যুগ, ফ্যাশানের যুগ। এই দুইয়ের দৌরাত্ম্য আমাদের এই পোড়া দেশেও লক্ষ করা যাচ্ছে। বাঙালী তরুণদের মধ্যে আজকাল অনেকেই আর বাবু হয়ে বসেন না, কারণ

চোঙা প্যান্টে সে কাজটা সম্ভব নয়। অথচ চোঙা প্যান্ট না পরলে ফ্যাশান থাকে না। পোশাকের ব্যাপারে যেটা সম্ভব, শিল্পের ব্যাপারেও যে সেটা ঘটতে পারে না এমন কোন ভরসা নেই। সুতরাং মনে হয় এই বেলা ভাষার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সত্যিই কি এই ভাষা সিনেমায় একটা নতুন পর্ব সূচিত করল, যার ফলে এ পর্যন্ত যা হচ্ছিল তা ওল্ড-ফ্যাশন্ড হয়ে গেল, নাকি এ ভাষাও চোঙা প্যান্টের মত এমন একটা কিছু যাতে সব কাজ চলে না ; ফলে অনেক কাজ বাদ দিতে হয়, কারণ তা না হলে ফ্যাশান থাকে না।

ভাষার ব্যাপারে পোশাকের উপমাটা অবান্তর নয়। পোশাকের মতই ভাষারও দুটো দিক আছে। একটা হল তার প্রয়োজন মেটানোর দিক বা functional দিক। এতে একটা বিশেষ ভাব প্রকাশের কাজটা হয়। অন্যটা হল আর্টের দিক—যেখানে ভাষার মাধুর্য, ভাষার ঋজুতা, ভাষার চটকদারিতা ইত্যাদির প্রশ্ন আসে। কোনো ভাষা যখন নতুন তৈরী হয়, তখন সেটা কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনেই হয়। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা মিটলে পরে ক্রমে শিল্পীর হাতে এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু পরিণত অবস্থাতেও কোন ভাষা চিরকালের জন্য টিকে থাকতে পারে না। কারণ যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন শিল্পীর মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ভাষায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি সুপ্রাচীন শিল্পকলার ভাবভঙ্গী তালগোল পাকিয়ে আজ থেকে ষাট বছর আগে যে চলচ্চিত্রের ভাষা তৈরী হতে শুরু হয়েছিল, সে কথা অনেকেই জানেন। প্রথম যে ছবি লোক ডেকে দেখান হয় তার বিষয়বস্তু ছিল—একটি ট্রেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াচ্ছে। এ ঘটনা যদি চলচ্চিত্র না হয়ে স্থিরচিত্রে দেখান হত, তাহলেও বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হত না। কিন্তু একটা তফাত আছে, সেটা হল এই যে চলচ্চিত্রে ঘটনাটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে (অর্থাৎ যতক্ষণ ছবি পর্দায় থাকছে ততক্ষণ) বিন্যস্ত। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংগীতের একটা সম্পর্ক রয়েছে, এবং ছবি হওয়া সত্ত্বেও সিনেমা জিনিসটা চিত্রকলা বা ফটোগ্রাফি থেকে পৃথক।

লুমিয়েরের তোলা এই ট্রেনের ছবি ছিল নাটক ও কাহিনী বিবর্জিত সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার সামিল। এর কিছু পরেই ক্রমে ছবিতে গল্প বলা শুরু হয়, এবং এই গল্প বলা থেকেই সিনেমার ভাষা একটা বিশিষ্ট চেহারা নিতে শুরু করে। এই ভাষা নির্মাণের ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ছিলেন, তিনি হলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মার্কিন পরিচালক ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ। ক্যামেরা ও এডিটিং-এর যে বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের উপর সিনেমার ব্যাকরণের ভিত্তি, তার প্রায় সব ক'টাই গ্রিফিথের আবিষ্কার। গ্রিফিথ প্রথমেই যে জিনিসটা বুঝেছিলেন সেটা হল এই যে, মুখে যেমন এক নিঃশ্বাসে গল্প বলা যায় না, অথবা সাহিত্যের গল্পও যেমন বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে রাখতে হয়, তেমনি সিনেমার গল্পকেও খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে ও খণ্ড খণ্ড শট্-এ ভাগ করে সাজিয়ে বলতে হয়। এক একটি শট্ এক একটি বাক্য বা শব্দের মত। কথার মতই

চোঙা প্যান্টে সে কাজটা সম্ভব নয়। অথচ চোঙা প্যান্ট না পরলে ফ্যাশান থাকে না। পোশাকের ব্যাপারে যেটা সম্ভব, শিল্পের ব্যাপারেও যে সেটা ঘটতে পারে না এমন কোন ভরসা নেই। সুতরাং মনে হয় এই বেলা ভাষার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সত্যিই কি এই ভাষা সিনেমায় একটা নতুন পর্ব সূচিত করল, যার ফলে এ পর্যন্ত যা হচ্ছিল তা ওল্ড-ফ্যাশন্ড হয়ে গেল, নাকি এ ভাষাও চোঙা প্যান্টের মত এমন একটা কিছু যাতে সব কাজ চলে না ; ফলে অনেক কাজ বাদ দিতে হয়, কারণ তা না হলে ফ্যাশান থাকে না।

ভাষার ব্যাপারে পোশাকের উপমাটা অবান্তর নয়। পোশাকের মতই ভাষারও দুটো দিক আছে। একটা হল তার প্রয়োজন মেটানোর দিক বা functional দিক। এতে একটা বিশেষ ভাব প্রকাশের কাজটা হয়। অন্যটা হল আর্টের দিক—যেখানে ভাষার মাধুর্য, ভাষার ঋজুতা, ভাষার চটকদারিতা ইত্যাদির প্রশ্ন আসে। কোনো ভাষা যখন নতুন তৈরী হয়, তখন সেটা কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনেই হয়। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা মিটলে পরে ক্রমে শিল্পীর হাতে এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু পরিণত অবস্থাতেও কোন ভাষা চিরকালের জন্য টিকে থাকতে পারে না। কারণ যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন শিল্পীর মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ভাষায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি সুপ্রাচীন শিল্পকলার ভাবভঙ্গী তালগোল পাকিয়ে আজ থেকে ষাট বছর আগে যে চলচ্চিত্রের ভাষা তৈরী হতে শুরু হয়েছিল, সে কথা অনেকেই জানেন। প্রথম যে ছবি লোক ডেকে দেখান হয় তার বিষয়বস্তু ছিল—একটি ট্রেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াচ্ছে। এ ঘটনা যদি চলচ্চিত্র না হয়ে স্থিরচিত্রে দেখান হত, তাহলেও বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হত না। কিন্তু একটা তফাত আছে, সেটা হল এই যে চলচ্চিত্রে ঘটনাটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে (অর্থাৎ যতক্ষণ ছবি পর্দায় থাকছে ততক্ষণ) বিন্যস্ত। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংগীতের একটা সম্পর্ক রয়েছে, এবং ছবি হওয়া সত্ত্বেও সিনেমা জিনিসটা চিত্রকলা বা ফটোগ্রাফি থেকে পৃথক।

লুমিয়েরের তোলা এই ট্রেনের ছবি ছিল নাটক ও কাহিনী বিবর্জিত সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার সামিল। এর কিছু পরেই ক্রমে ছবিতে গল্প বলা শুরু হয়, এবং এই গল্প বলা থেকেই সিনেমার ভাষা একটা বিশিষ্ট চেহারা নিতে শুরু করে। এই ভাষা নির্মাণের ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ছিলেন, তিনি হলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মার্কিন পরিচালক ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ। ক্যামেরা ও এডিটিং-এর যে বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের উপর সিনেমার ব্যাকরণের ভিত্তি, তার প্রায় সব ক'টাই গ্রিফিথের আবিষ্কার। গ্রিফিথ প্রথমেই যে জিনিসটা বুঝেছিলেন সেটা হল এই যে, মুখে যেমন এক নিঃশ্বাসে গল্প বলা যায় না, অথবা সাহিত্যের গল্পও যেমন বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে রাখতে হয়, তেমনি সিনেমার গল্পকেও খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে ও খণ্ড খণ্ড শট্‌-এ ভাগ করে সাজিয়ে বলতে হয়। এক একটি শট্ এক একটি বাক্য বা শব্দের মত। কথার মতই

শট্-এর ভাষা আছে, যেটা একান্তই ছবির ভাষা, দৃশ্যবস্তুর ভাষা। আবার সাহিত্যের গল্পকেও যেমন অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদে ভাগ করার দরকার হয়, তেমনি সিনেমার গল্পকেও mix বা fade জাতীয় কতগুলি বিশেষ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উপায়ে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব।

এছাড়া ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলে ক্লোজ-আপ, মিড-শট, লং-শট, টপ-শট ইত্যাদির উদ্ভব, এবং বক্তব্য অনুযায়ী তাদের সার্থক প্রয়োগও প্রথম গ্রিফিথই করেন। চরিত্রের মনের ভাব তার আকৃতি বা অঙ্গভঙ্গীর ডিটেলের সাহায্যে প্রকাশ করার জন্য ক্লোজ-আপের উদ্ভব। এই ক্লোজ-আপ ব্যবহার না করে আজও ছবি করা সম্ভব নয়।

ক্লোজ-আপ যখন এল, তখন নাটকীয় উপাদান সত্ত্বেও মঞ্চের নাটকের সঙ্গে সিনেমার একটা স্পষ্ট পার্থক্য স্থাপিত হল, কারণ নাটকের দর্শকের পক্ষে অভিনেতার অত কাছে যাওয়া সম্ভব নয়; এখানে দর্শক প্রেক্ষাগৃহের চৌকিতে অনড়, ফলে নাট্যদৃশ্য থেকে তার দূরত্ব এদিক ওদিক হবার কোন উপায় নেই।

সিনেমাতে সে সুযোগ আছে বলেই ক্যামেরাকে আগু-পিছু করা হয় তা নয়; এর একটা শিল্পগত প্রয়োজনও আছে, এবং এই প্রয়োজনটা গ্রিফিথই প্রথম অনুভব করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, মঞ্চের নাটকের সঙ্গে দর্শকের যে সরাসরি সম্পর্ক, সিনেমায় সেটা নেই। এখানে সে সম্পর্কটা স্থাপিত হচ্ছে ক্যামেরার মাধ্যমে। কোন তৃতীয় ব্যক্তির জবানিতে যদি আমাদের একটি নাটকীয় ঘটনার বিবরণ শুনতে হয়, তাহলে সেই বিবরণে নাট্যরস সঞ্চারিত হল কি না সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বর্ণনাদাতার উপর। সিনেমার ক্যামেরা এই বর্ণনাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘটনা যাই হোক না কেন, সেটা রসিয়ে বলার ভার পরিচালকের আজ্ঞাধীন ক্যামেরার উপর। সিনেমার ভাষা তাই প্রধানত ক্যামেরার ভাষা; একথা গ্রিফিথের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়ে গেছে।

গল্প বলার প্রয়োজনে শট্-এর পর শট্ জুড়ে গ্রিফিথ ক্রমে চলচ্চিত্রের সাংগীতিক দিকটা সম্পর্কে সচেতন হন। বক্তব্য বিন্যাসের জন্য সিনেমার একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় সেটা আগেই বলেছি। গ্রিফিথ দেখলেন যে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন ভাব-সম্বলিত শট পর পর জুড়লে শুধু যে গল্প বলার কাজ হচ্ছে তা নয়, তার সঙ্গে কাহিনী-বিন্যাসে একটা ছন্দের সঞ্চার হচ্ছে। সংগীতের তাল ফাঁক লয় ও স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা বা ওঠা-নামার সঙ্গে সুরের ভাব-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে যেমন একটা মিশ্র ছন্দ তৈরী হয় তেমনি এখানেও দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্বের তারতম্য ও শট-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্যের সঙ্গে বিষয়বস্তুর ভাব-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে একটা জটিল মিশ্র ছন্দের উদ্ভব হচ্ছে।

গ্রিফিথের প্রাথমিক উপলব্ধির ফলে সিনেমার এই ছন্দোময় সাহিত্য-নাটক-চিত্রকলা-সংগীতাশ্রিত ভাষা নির্বাক যুগের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ১৯১৫ নাগাদ) বেশ একটা স্পষ্ট চেহারা নিয়েছিল। এই ভাষার ব্যাকরণকে আয়ত্ত করে মোটামুটি চলনসইভাবে ছবির বক্তব্য প্রকাশ করা প্রায় যে কোন পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে আরও জোরালো

ও সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন আমেরিকা ও আমেরিকার বাইরে ইউরোপে কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পী।

হলিউডেই স্ল্যাপস্টিক কমেডির চলচ্চিত্র ব্যাকরণ রচনা করলেন ম্যাক সেনেট। থিয়েটারে যা ছিল ভাঁড়ামো, সিনেমায় তা হয়ে দাঁড়াল উঁচু দরের আর্ট। সেনেটও বুঝেছিলেন যে, থিয়েটারের ব্যঙ্গ-কৌতুক শুধু ক্যামেরায় তুলে গেলে কমেডি কমিক হবে না। এখানেও ক্যামেরা ও এডিটিং-কে হাসির খোরাক জোগাতে হবে। সেনেটের সূত্র ধরেই যেসব কৌতুকাভিনেতা সিনেমায় খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন ও বাস্টার কীটনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ-সচেতন দরদী শিল্পী চ্যাপলিন তার কমেডির মধ্যে মানবিক আবেদন এনে ফেললেন। নতুন নতুন সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করার প্রয়োজনে তিনি সেনেটের ভাষার উপর নিজস্ব কারুকার্য প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। Mime বা মূক অভিনয়ে চ্যাপলিন ছিলেন অদ্বিতীয়। অঙ্গভঙ্গীর যে কতরকম ভাষা হতে পারে তা চ্যাপলিনের ছবিতেই প্রথম দেখা গেল। তাছাড়া চোখ-মুখের ভাবের ভাষাতেও চ্যাপলিন অতুলনীয়। City Lights-এর বিখ্যাত শেষ ক্লোজ-আপে হাতে ধরা একটি গোলাপের ডাঁটায় মৃদু কামড়ের সঙ্গে একটি বিশেষ হাসি ও চোখের একটি বিশেষ চাহনিতে মনের একটা জটিল কুণ্ঠা ও সংশয় মিশ্রিত ভাবপ্রকাশ যারা দেখেছে, তারা কোনদিনও ভুলবে না। কথার আশ্রয় না নিয়ে কেবল সূক্ষ্ম অভিনয়ের সাহায্যে কীভাবে মানুষের মনের ভাব ক্যামেরার সামনে ব্যক্ত করা যায়, এ নিয়ে চিত্র-রচয়িতারা আজ এই সবাক যুগেও সর্বদাই চিন্তা করেন।

Gold Rush ছবির একটি দৃশ্যে চ্যাপলিন বোঝাতে চাইলেন যে, দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তার বন্ধু তাকে বার বার মুরগি বলে ভ্রম করেছে। এই ভাব প্রকাশ করার জন্য তাঁকে সিনেমার একটি বিশেষ রাসায়নিক উপায় অবলম্বন করতে হল। এর নাম Superimposition। এর ফলে এই দেখছি মানুষ, আবার এই হয়ে গেল মুরগি—অথচ পরিবেশ একই রয়েছে। আর একটি যান্ত্রিক উপায়ে নির্বাক যুগের স্ল্যাপস্টিক কমেডির প্রায়ই ব্যবহার করা হত, যেটাকে বলা হয় fast motion। এটাও একটা ক্যামেরার কারসাজি, এবং এর ফলে মানুষ চেহারায় মানুষ থাকলেও তার গতিবিধি ক্ষিপ্রগতি কলের মানুষের মত হয়ে যায়।

শিল্পী হিসাবে বাস্টার কীটন চ্যাপলিনের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না, তবে তাঁর মেজাজ ছিল অন্যরকম। কীটন যেন আরও নৈর্ব্যক্তিক, আরও নিরাবেগ, আরও মননশীল। তাঁর ছবিতে চ্যাপলিনের মত চোখের জল ফেলার সুযোগ নেই। তাঁর নিজের মুখে একটি বই দ্বিতীয় কোন অভিব্যক্তি কখনো প্রকাশ পায়নি। এবং এই অভিব্যক্তিকে অভিব্যক্তির অভাব বললে ভুল হবে না। কীটনের হাসির দৃশ্যের বিমূর্ত জ্যামিতিক প্যাটার্নের দিকটা চ্যাপলিনের চেয়েও অনেক বেশী প্রকট। ফলে কীটনের ছবিতে ক্লোজ-আপের চেয়ে মিড-শট লং-শটের ব্যবহার অনেক বেশী।

কমেডির তাগিদে একটি জিনিসের উদ্ভব হয়েছিল, সেটা কমেডির ভাষায় মস্ত বড় হাতিয়ার। সেটা হল Tracking Shot। এখানে ক্যামেরা তেপায়ার উপর এক জায়গায় স্থির না থেকে গাড়ির বা Trolley-র উপর বসে ছুটতে থাকে। সাধারণত

কোন চলন্ত জিনিসের শট্ তার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত অবস্থায় নেওয়ার জন্যই ক্যামেরার এই ব্যবহার। গতি হল স্ল্যাপস্টিক কমেডির প্রাণ, কারণ এখানে চরিত্র বিশ্লেষণের বালাই নেই। সব চরিত্রই type চরিত্র। ঠায়ে গল্প বলার তাগিদ নেই। মন্থরগতি ভাবাবেগাপ্লুত রোমান্টিক দৃশ্যের অবকাশ নেই। এখানে হালকা গল্পকে ছুটে চলতে হয় উদ্দাম বেগে, আর সেই সঙ্গে ছুটে চলে মানুষ, ঘোড়া, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি সবকিছুই। এদের সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাও যদি ছোটে, তবেই দর্শকের মনও এই ছোটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছুটে চলতে পারে। এই ক্যামেরার গতির সঙ্গে আবার এডিটিং-এর শট্-পরিবর্তনযুক্ত গতি আরো দশ গুণ বেড়ে যায়।

এই যে নির্ভেজাল গতির আনন্দ—যে আনন্দ আমাদের খেয়াল সংগীতের জলদের অংশেও পাওয়া যায়—এটা স্ল্যাপস্টিক ছাড়াও আরেক জাতীয় ছবিতে প্রায় প্রথম যুগ থেকেই হলিউড অত্যন্ত জবরদস্ত ভাবে ব্যবহার করে আসছে—সেটা হল 'western' জাতীয় কাহিনীতে।

আমেরিকান ছবির অনেক ভঙ্গীই ইউরোপের কিছু পরিচালককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার গণবিপ্লবের পরে লেনিন বুঝেছিলেন যে সিনেমাকে চমৎকার ভাবে প্রচারের কাজে লাগানো যেতে পারে। লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী যে ক'জন তরুণ উৎসাহী পরিচালক চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : এঁরা হলেন আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন ও দোভজেঙ্কো। এঁদের বিশেষত্ব হল এই যে, তিনজনই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লববাদ প্রচারের মধ্যে দিয়ে তিনটি স্বতন্ত্র মেজাজের সার্থক চলচ্চিত্র রচনা করতে পেরেছিলেন।

ইউক্রেনিয় কৃষক পরিবারের ছেলে দোভজেঙ্কো। নিজের দেশে লেখাপড়া শিখে প্যারিসে গিয়ে চিত্রকলা অধ্যয়ন করেছিলেন; তাঁর ছবিতে চিত্রগুণ ত আছেই, তার সঙ্গে আছে এক আশ্চর্য কাব্যময়তা। Earth ছবিতে চাষার ছেলে ভ্যাসিলি কুলাকের চক্রান্তে নিহত হন। অন্য চাষারা এসে তার মৃতদেহ কাঁধে করে আপেলের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলেছে সৎকারের জন্য। একটি ক্লোজ-আপ এল, তাতে দেখা গেল মৃত ভ্যাসিলির গালে ঝুলন্ত পাকা আপেলের ছোঁয়া লাগল। এই ইমেজ যেভাবে যে অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করেছে, তা একমাত্র সিনেমার ভাষাতেই সম্ভব।

পুদোভকিনের যেটা প্রধান গবেষণার বিষয় ছিল, সে গবেষণার এখনো শেষ হয়নি। সেটা হল—মানুষের অন্তরের গভীর ভাব কথার আশ্রয় না নিয়ে কী ভাবে ছবিতে প্রকাশ করা যায়। এই প্রশ্নের সঙ্গে অবিশ্যি মনস্তত্ত্ব ও behaviorism নিবিড়ভাবে জড়িত। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে গভীর অনুভূতির সংমিশ্রণের ফলে চলচ্চিত্রকার মানুষের মনের দরজাটি ক্যামেরার সামনে খুলে দিতে পারেন। অবিশ্যি অভিনেতার ক্ষমতাও (অথবা স্বাভাবিক ক্ষমতার অভাবে পরিচালকের নির্দেশানুবর্তিতা) এখানে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। যেসব পরিচালক তাঁদের ছবিতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন পুদোভকিন তাঁদের অন্যতম।

এই তিনজন পরিচালকের মধ্যে আইজেনস্টাইন ছিলেন সবচেয়ে বড় তত্ত্ববিদ্

পণ্ডিত। গ্রিফিথের এডিটিং-এর সূত্রে তিনি তাঁর বিখ্যাত montage-এর রীতি প্রবর্তন করেন। আইজেনস্টাইন বুঝেছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শট পর পর জুড়লে একটি নতুন অর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হতে পারে ; অথবা যে শটের কোন স্পষ্ট অর্থ নেই, সে শটও অন্য আরেকটি অর্থহীন বা অর্থবোধক শটের সঙ্গে জুড়লে দুইয়ে মিলে একটা স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত করা যায়। এর নামই montage। এই montage-এর উদাহরণ শুধু আইজেনস্টাইনেই নয়, সবাক যুগের যে কোন পর্বের ছবিতেই পাওয়া যাবে। Montage চলচ্চিত্রের ভাষার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় নির্বাক যুগে যেসব পরিচালক সিনেমার ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করে সার্থক ছবি তৈরী করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডেনমার্কের কার্ল ড্রায়ার, সুইডেনের শিলার ও শোস্ট্রম, জারমানির মুর্নাউ, পাবস্ট, লাং, লুবিচ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ড্রায়ারের ছবি The Passion of Joan of Arc আজও পুরোন হয়নি। কারণ এ ছবিতে তিনি যেভাবে ক্যামেরা ও অভিনয়ের সাহায্যে Joan চরিত্রের অন্তরতম বেদনার ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেটা কোন সাময়িক ফ্যাশানের অপেক্ষা রাখে না। সুইডেন ও জার্মানির পরিচালকেরা নানান ধরনের চিত্রভাষায় নানা ধরনের গল্প বলে গেছেন। গল্পের দিকেই এদের ঝোঁক ছিল বেশী, এবং গল্পের বিভিন্ন মুড প্রকাশের ব্যাপারে ফটোগ্রাফির কম্পোজিশন ও আলোর ব্যবহার কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পরিবেশে কী আশ্চর্যভাবে কার্যকরী হতে পারে সেটা এইসব ছবি দেখলে বোঝা যায়। নির্বাক যুগে জার্মানির যারা শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান, তারা অনেকেই সবাক যুগে হলিউডে গিয়ে সবাক ছবির উন্নতির পথটা সহজ করে দিয়েছিলেন।

৩

সবাক যুগের গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র অতিমাত্রায় কথানির্ভর হয়ে প্রায় থিয়েটারের পথে চলে গিয়েছিল, সে কথা আমরা জানি। 'টকি' নামটার মধ্যেই এই ভুল বোঝার ইঙ্গিত রয়েছে, কারণ ধ্বনি বলতে ত শুধু 'টক' বোঝায় না। অবিশ্যি ভুল ভাঙার পর আপনা থেকেই 'টকি' নামটা লোপ পেয়ে গিয়ে আবার 'মুভি' কথাটা চালু হয়ে গিয়েছিল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, নির্বাক ছবিতে শব্দ যোজনা সত্ত্বেও শব্দ কখনই ছবির উপর আধিপত্য করতে পারেনি বা পারবে না। অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে—ছবিকে উপেক্ষা করে যদি কেবল শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে সিনেমার ভাষা দুর্বল হতে বাধ্য। একটা উদাহরণ দিলে এটার কারণ বোঝা যাবে। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে, আমরা যখন কোন চিন্তায় গভীরভাবে তন্ময় হয়ে থাকি, তখন পারিপার্শ্বিক অনেক শব্দ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ি—এমন কি তিনবার না ডাকলে হয়ত ডাকে সাড়া দিই না। কান সম্বন্ধে এটা সত্যি হলেও চোখের ব্যাপারে এটা খাটে না। চোখ খোলা থাকলে অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও আমরা চোখের সামনে সব কিছুই দেখতে পাই, কেবল আমাদের চোখের focus কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উপর নিবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ চোখ ও কান, এই দুইয়ের

মধ্যে প্রথম ইন্দ্রিয়টাই বেশি সক্রিয়। কাজেই সিনেমায় যখন দৃশ্যের সঙ্গে ধ্বনি যোগ হল, তখন পরিচালক তার হাতে ভাব প্রকাশের একটা নতুন হাতিয়ার পেলেন বটে, কিন্তু সেটা ছবির চেয়ে বেশি জোরালো কিছু নয়।

তবে ধ্বনিযোগের ফলে চলচ্চিত্রে ভাবপ্রকাশ যে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং স্বভাবতই ধ্বনিযুক্ত ছবি বাস্তবের আরেক ধাপ কাছে এগিয়ে এসেছিল। এর ফলে ছবির বিষয়বস্তুর পরিধিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

সবাক চিত্রের প্রাথমিক ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯২৮ সালে আমেরিকায় প্রথম সবাক ছবি তোলা হয়। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি এমন একটা অবস্থা এসে গিয়েছিল যখন ধ্বনির দিকটা বিবেচনা করে চলচ্চিত্রের একটা নতুন ব্যাকরণ লেখা সম্ভব। বলা বাহুল্য, সিনেমার তত্ত্ববিদরা একাজে অবহেলা করেননি।

গ্রিফিথের কতকগুলি প্রাথমিক আবিষ্কার সবাক যুগেও টিকে গিয়েছিল। ক্যামেরা ও এডিটিং-এর প্রায় সব নিয়মই এই নতুন ভাষাতেও প্রয়োগ করা চলত। যন্ত্রের উন্নতির ফলে ক্যামেরা ও রসায়নাগারের কাজও সহজ হয়ে এসেছিল বা এমন কি যেসব কাজ আগে আদৌ সম্ভব ছিল না, সে কাজও করার সুযোগ এসে পড়েছিল। ফলে চলচ্চিত্রভাষার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। নির্বাক যুগে ভোর বা সন্ধ্যার আগে ছবি তোলা তখনকার দিনের ফিল্ম দ্বারা সম্ভব ছিল না, বা উপযুক্ত ফিল্টারের অভাবে সূর্যের আলোতে ছবি তুলে তাকে রাতের জ্যোৎস্না বলে চালানো সম্ভব ছিল না। উনিশশো ত্রিশের মাঝামাঝি এই কাজগুলোও সম্ভব হয়ে পড়ল। তারপর রঙীন ছবি যখন শুরু হল, তখন ত আরেক বিপ্লব এল বলা চলে, কারণ পরিচালক রঙের সাহায্যে তার ছবির মধ্যে দিয়ে আরো নতুন ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। (রঙ কীভাবে কথা বলতে পারে তার একটা উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাঙালি মেয়ের সিঁথির সিঁদুর সাদা-কালো ছবিতে চুলের সঙ্গে তফাৎ করা যায় না। রঙীন ছবিতে শুধু মেয়ের মুখের ক্লোজ-আপ দেখিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যায় সে কুমারী না বিবাহিতা)।

শব্দের ফলে একটা প্রধান পরিবর্তন এসেছিল ছবির অভিনয়ের রীতিতে। নির্বাক যুগে কথার অভাব পূরণ করার জন্য অভিনেতাকে ভাব প্রকাশের জন্য অনেক সময় কিছু অস্বাভাবিক মুদ্রার আশ্রয় নিতে হত। শব্দ এসে পড়ায় এসবের আর কোন প্রয়োজন রইল না এবং থিয়েটারি সংলাপ লেখার বাতিক শেষ হলে পর অভিনয় ক্রমে স্বাভাবিক হতে শুরু করল। তার মানে এই নয় যে চলচ্চিত্রে নাট্যরসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আসলে চিত্রচরিতারা ক্রমে যেটা বুঝতে পারলেন সেটা এই যে, ছবির কাহিনীর নাট্যরস প্রধানত ক্যামেরা ও এডিটিং-এর বিশেষ বিশেষ ব্যবহারেই ফুটে ওঠে ; তার জন্য অভিনয় বা সংলাপকে নাটকের সুরে বাঁধার কোন প্রয়োজন হয় না।

ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি থেকেই বিদেশী (বিশেষ করে মার্কিন) ছবিতে একটা সহজ সাবলীলতা এবং তার সঙ্গে ধ্বনি প্রয়োগের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এর মানে হল যে দৃশ্য ও ধ্বনির সমন্বয় কীভাবে হওয়া উচিত সেটা অনেক পরিচালকই বুঝে ফেলেছিলেন। শিল্পের বিচারে অবিশ্যি এই সাবলীলতা যথেষ্ট ছিল না। একটা বিশেষ ধরনের ছন্দোময়তা, ছবি ও ধ্বনির সমন্বয়ে একটা বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি, চরিত্র ও বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে তার মধ্যে সজীবতার সঞ্চার, এবং সব শেষে ছবির উপরে রচয়িতার একটা বিশেষ মেজাজ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ—এই সবকিছুর উপরেই ছিল শিল্পের বিচার।

অনেক সময়ই দেখা গেছে যে ছবি যদি সাংগীতিক গুণে (অর্থাৎ ছন্দ, গতি, কন্ট্রাস্ট ইত্যাদি গুণে) বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সে গুণ বিষয়বস্তুর মামুলিত্ব ছাপিয়ে শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পারে। জন ফোর্ডের অনেক Western ছবি, হিচককের কিছু ছবি, লুবিচের হাসির ছবি—সবই এই জাতীয় শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। আবার এও দেখা গেছে যে ছবিতে সাংগীতিক গুণ থাকুক বা না থাকুক, কেবল বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং চরিত্র ও পরিবেশের ব্যঞ্জনাময় ডিটেল সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রধর্মী প্রকাশের ফলেই ছবি স্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ দোনস্কয়ের Childhood of Maxim Gorky বা ইদানিং কালের জাপানী পরিচালক ওজুর কিছু ছবির নাম করা যেতে পারে। এসব ছবির গুণ মহৎ সাহিত্যের গুণ; তবে একে চলচ্চিত্রবিরোধী বলা চলে না, কারণ এসব ছবিতে চরিত্র ও পরিবেশের প্রকাশ হয়েছে ক্যামেরা ও অভিনয় দ্বারা ব্যক্ত অজস্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলের সাহায্যে।

চলচ্চিত্রের ধর্ম বজায় রেখে একই ছবিতে সাংগীতিক ও সাহিত্যিক এই দুই গুণের সার্থক সমন্বয় সহজ ব্যাপার নয়, কারণ সিনেমার আঙ্গিকের দিকটা বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। সংগীতের মত বিমূর্ত শিল্পে রচয়িতা ফর্মকে ইচ্ছামত গড়েপিটে নিতে পারেন; বিমূর্ত পেন্টিং-এও এটা সম্ভব। এখানে একমাত্র কর্তৃত্ব করে সৃষ্টিকর্তার শিল্পসত্তা। কিন্তু চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু যেখানে বাস্তবধর্মী সেখানে তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে তাকে বেঁধে ফেলতে হলে সব সময় রচয়িতার খেয়ালখুশি মতো গড়েপিটে নেওয়া চলে না। বিশেষত কাহিনীর চরিত্রাবলী ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক যদি জটিল হয় তাহলে এ কাজটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সিনেমার গল্পতে তাই এ ধরনের জটিলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পকলা দর্শকদের সুসংবদ্ধ প্লট ও সহজবোধ্য সরল চরিত্রের পথেই নিয়ে যেতো। সুতরাং চল্লিশ দশকের ছবির যে ভাষা ও প্রকৃতি, তার জন্য চিত্রনির্মাতাদের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের দায়িত্বের কথাটাও মনে রাখা দরকার। দর্শক কী বোঝে, কী চায়, কিসে খুশি—এ প্রশ্নগুলো কোন চিত্রনির্মাতাই সহজে উপেক্ষা করতে পারতেন না। দর্শক চায় নিটোল প্লট সম্বলিত কাহিনী—তা কমেডিই হোক বা ট্র্যাজিডিই হোক, সমসাময়িকই হোক বা পৌরাণিকই হোক—দর্শক চায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, চায় সুদর্শন নায়ক নায়িকা (যে কারণে স্টার সিস্টেমের উৎপত্তি), চায় মনোরম বহির্দৃশ্যাবলী ও ছিমছাম সুদৃশ্য পরিবেশ, আর চায় বিভিন্ন রসের একটা উপভোগ্য সমন্বয় যাতে সবশেষে মনটা বেশ ভরে যায়। আশ্চর্য এই যে, এই অকাট্য ফরমূলার

মধ্যেও অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে—যদিও ভাষার ব্যাপারে তাতে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য কিছু থাকা সম্ভব নয়। তবে এই অবস্থায় এটাও স্বাভাবিক যে যখনই কোন গুণী শিল্পী গতানুগতিকের বাইরে কিছু করতে চাইতেন, তখনই তাঁকে অজস্র বাধার সামনে পড়তে হত। এই চল্লিশ দশকেও আমেরিকার বাইরে ভাষার দিক দিয়ে কিছু অসাধারণ নতুন ছবি হয়েছিল (যেমন ফ্রান্সে জাঁ ভিগোর L' Atalante বা Zero de Conduite), কিন্তু সংখ্যায় তা এতই কম, এবং তার প্রচার এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, সেসব ছবি দর্শক বা সমালোচকদের মনে ব্যাপকভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। আজ এসব ছবির কদর হয়েছে, কারণ যুগ পরিবর্তনের ফলে আজ চলচ্চিত্রের সমঝদারীর ভোল পালটে গেছে।

৪

১৯৩৯ সালে ফরাসী পরিচালক জাঁ রেনোয়া রচনা করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি La Regle du Jeu (Rules of the Game)। ভাষার দিক দিয়ে এটা যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি ছবির মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম সেটা তখনকার সমালোচকেরা অনুধাবন করতে পারেনি। মূল্যায়নের অভাবের একটা কারণ হয়ত এই যে ছবিটির প্রদর্শন খুব অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। রেনোয়া এ ছবিতে ফরাসী উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অপ্রীতিকর বাস্তব চেহারা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। ফলে চারিদিক থেকে ছবিটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়, এবং সেই কারণে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনার বছর দশেক পরে ছবিটি বিদগ্ধ মহলে আবার দেখানো হয়, এবং তখনই সমালোচকেরা La Regle du Jeu এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হন।

একটি নতুন ধরনের কাহিনীকে চিত্রোপযোগী উপায়ে ব্যক্ত করার জন্য রেনোয়া এই ছবিতে অনায়াসে একটি নতুন ভাষা আবিষ্কার করে ফেললেন। La Regle du Jeu-এ প্রথম লক্ষ করার বিষয় হল যে এতে কেন্দ্রস্থ চরিত্র বলে কিছু নেই। দশটি কি বারোটি অর্থবান ভোগবিলাসী স্ত্রীপুরুষ, তাদের ভৃত্যস্থানীয় কয়েকটি চরিত্র এবং এদেরই সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অথচ এই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে বেমানান একটি আগন্তুককে অবলম্বন করে এর কাহিনী। প্লট বলতে যা বোঝা যায় তা এতে নেই, তবে কাহিনীর একটা পরিণতি আছে, এবং কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ কয়েকটি শ্রেণী সম্পর্কে অসাধারণ তীক্ষ্ণ মন্তব্য আছে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে যেমন একাধিক সুর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে কাউন্টারপয়েন্ট সৃষ্টি করে, তেমনি একাধিক চরিত্রের পরস্পরের সম্পর্ক একই সঙ্গে বিবৃত করার দুরূহ প্রয়াস করেছিলেন রেনোয়া।

কাহিনীর ঘটনাস্থল একটি বাগানবাড়ি, আর দুই তিনদিনের মধ্যে ঘটনার বিন্যাস। এতে এমন অনেক দৃশ্য আছে যেখানে বাড়ির একটি ঘরে হয়ত দুটি বা তিনটি চরিত্রকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটছে। আর সেই সময় একই সঙ্গে পিছনে খোলা দরজা দিয়ে আরেকটি ঘরে অন্য কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা থেকে এই ঘটনার দূরত্ব এক নয় বলে রেনোয়াকে একটি সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে ক্যামেরার কাছে এবং

দূরে সমান স্পষ্টতা রাখতে হলে অত্যন্ত বেশি আলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এটা কেউই করতো না, কারণ চিরকালই যে কথাটা মেনে নেওয়া হয়েছে সেটা হল এই যে, সম্মুখপটই মুখ্য এবং পশ্চাৎপট গৌণ। রেনোয়া অতিরিক্ত আলো ব্যবহার করে সামনে পিছনে একই ফোকাস রাখার রীতি এই ছবিতে প্রথম ব্যবহার করলেন। আজ এই রীতি deep focus নামে সুপরিচিত।

এটা লক্ষ করার বিষয় যে, রেনোয়া এর কিছুকাল পরেই হলিউডে গিয়ে একটি বিখ্যাত ছবি তোলেন, যেটায় তিনি deep focus ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। The Southerner ছবি যারা দেখেছেন তারাই এর সহজ চিত্রভাষার কথা জানেন। তার মানে এই নয় যে, রেনোয়া শিল্পী হিসেবে হঠাৎ পিছিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে একটি কৃষক পরিবারের অনাড়ম্বর জীবনালেখ্য উপস্থাপনের জন্য La Regle du Jeu-র জটিল প্রকাশভঙ্গীর কোন প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। মহৎ শিল্পী সব সময়ই তাঁর সৃষ্টিতে নিজের স্বাক্ষর রেখে যান ; সেই জন্যেই বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষভাবে তার কাজের মধ্যে দিয়ে সব সময়ই তাকে চিনতে পাওয়া যায় (যদি না সেটা অনিচ্ছাকৃত ফরমাইশি কাজ হয়ে থাকে)। প্রশ্নটা হচ্ছে—রেনোয়াকে কি এই ভিন্নধর্মী দুটি ছবিতেই রেনোয়া বলে চেনা যায় ? এর উত্তর হল—ছবির শুধু বাইরের দিকটা দেখলে চেনা যায় না। কিন্তু রেনোয়ার বেলা শুধু ছবির বাইরের বিচারটা একেবারেই অসঙ্গত, কারণ রেনোয়া মোটেই আঙ্গিকসর্বস্ব পরিচালকের দলভুক্ত নন। তাকে চিনতে হলে ছবির ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। রেনোয়ার যেটা সবচেয়ে বড় গুণ সেটা হল তাঁর মানবিকতা। রেনোয়া সৃষ্ট চরিত্রগুলি শুধু সজীব নয়, তারা দোষে গুণে মিলিয়ে এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ। মানব চরিত্রের এই প্রকাশ যেমন La Regle du Jeu-তে, তেমনি The Southerner-এও স্পষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে রেনোয়া দুটি ছবিতেই একই ভাষায় কথা বলেছেন। ছবির এই বিশেষ ভাষা ফ্যাশনের তোয়াক্কা রাখে না। তাই আজ বিশ বছর পরেও এ দুটি ছবির কোনটাকেও ওল্ড-ফ্যাশনড় বলে মনে হয় না।

La Regle du Jeu-র তিন বছর পরে আমেরিকায় Citizen Kane-এর আবির্ভাব হয়। এটিও ব্যবসায়িক গণ্ডীর মধ্যে তোলা ছবি এবং এটিও ছবি তোলার প্রচলিত বিধির একটি বিরাট বিপ্লবাত্মক ব্যতিক্রম। অরসন ওয়েল্‌স রচিত এই ছবির ভাষায় হলিউডের গতানুগতিক ছবির ভাষা তথা মার্কিন জনসাধারণের কিছু গতানুগতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। Kane-এর কেন্দ্রস্থ চরিত্র হল একটি খাঁটি আমেরিকান আর্কি-টাইপ—যাকে বলা হয় Tycoon, অর্থাৎ এক শ্রেণীর বিশাল প্রতিপত্তিসম্পন্ন ধনকুবের। এহেন চরিত্রের প্রতি মার্কিন জনসাধারণ সচরাচর একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে থাকেন। এ জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জনসাধারণের চোখ খুলে দিতে চেয়েছিলেন অরসন ওয়েল্‌স। তাঁর নির্মম বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটি বিশেষ চিত্রভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছিল তাঁকে। এর আগে বিশ বছর ধরে হলিউডের সবাক চিত্রে যে রীতি প্রায় সব পরিচালকরাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদবাক্যের মত মেনে

নিয়েছিলেন, তার মূল কথা হল—দর্শকদের অতিরিক্ত পীড়া না দেওয়া। দর্শকদের চোখ কান ও মন এই তিনটে সম্পর্কে একটা সজাগ সাবধানতা অবলম্বন করে হলিউডের ছবি তৈরি হয়ে আসছিল। ওয়েল্স অম্লানবদনে এই তিনটিকেই এক সঙ্গে আঘাত করলেন। চোখের দিক দিয়ে Kane ছবিতে লক্ষ্য করা গেল একটা রূঢ় তীক্ষ্ণতা বা Sharpness, যেটা দৃশ্যপটের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত (প্রসঙ্গত ক্যামেরাম্যান গ্রেগ টোল্যাণ্ড এ-ছবিতেও deep focus ব্যবহার করেন।) হলিউডের প্রচলিত রীতিতে নায়িকার চেহারার দিকে মেকআপম্যান ও ক্যামেরাম্যানকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হত, পাছে তার ত্বকের অমসৃণতা ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ওয়েল্স তার নায়িকার ক্ষেত্রে এ রীতি মানলেন না।

কানের দিক দিয়ে ছবির সংলাপ এই প্রথম এক অপরিশুদ্ধ বাস্তব চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল। আর মনের দিক দিয়ে দর্শক কাহিনী-বিন্যাসের এক অভিনব জটিল অথচ সংগত flashback পদ্ধতির সম্মুখীন হয়ে হিমসিম খেয়ে গেল।

Citizen Kane চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। এর পরেই ওয়েল্স Magnificent Ambersons ছবিতে ভাবা নিয়ে আরো অনেক নতুন পরীক্ষার পরিচয় দিলেন। নাটকীয় দৃশ্যে লেনস্, আলো ও দৃষ্টিকোণের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় এ দুটো ছবিতে। কিন্তু এই দুটো ছবিই ছিল তখনকার দর্শকের পক্ষে অতিআধুনিক ; ফলে দুটি ছবিই ব্যবসার বিচারে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হল, এবং ভগ্নোদ্যম ওয়েল্স অচিরেই Thriller-এর আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তার পরবর্তী ছবিতেও ওয়েল্সের আঙ্গিকগত স্বকীয়তার অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে যে seriousness ও সমাজসচেতনতা Kane বা Ambersons-এ আছে, তার কোন লক্ষণ পরের ছবিতে নেই।

উনিশশো পঞ্চাশ কি একান্ন সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় জাপানী পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার ছবি Rasho Mon। এ ছবি উৎসবে উপস্থিত সমঝদারদের আশ্চর্যভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর কারণ ছিল Rasho Mon-এর অভিনব বিষয়বস্তু ও আশ্চর্য চিত্রভাষা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল এই ছবিতে। জাপানের কাবুকি ও নো নাটকের অভিনয়রীতি, জাপানী উডকাটের চিত্রকল্প ও কম্পোজিশন, মার্কিন western-সুলভ ক্ষিপ্রগতি ও যে কোন দেশীয় মহৎ উপন্যাসসুলভ মন্থর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্র বিশ্লেষণ—এ সবই একটি ছবির মধ্যে আশ্চর্য ভাবে মিশে খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

কুরোসাওয়ার পরের দিকের ছবি দেখে বোঝা গেছে তিনি বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তাঁর চিত্রভাষা যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করতে সক্ষম। আর আশ্চর্য এই যে, নানান স্টাইলের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও স্টাইলের খিচুড়ি জিনিসটা তিনি আশ্চর্যভাবে এড়িয়ে গেছেন।

এখানে আরেকটি জাপানী পরিচালকের অভিনব ভাষার কথা বলা দরকার। ইনি হলেন ইয়াসুজিরো ওজু। ওজুর ছবি দেখলে মনে হয় তিনি বুঝি পাশ্চাত্যের কোন ছবি কোনদিন দেখেননি বা পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁর নেই। দৃশ্যকে বিভিন্ন শট-এ ভাগ করার রীতি অবশ্যই ওজু ব্যবহার করেন, কিন্তু

এক্ষেত্রে আর কোন প্রচলিত পন্থাতেই যেন তাঁর আস্থা নেই। যেমন তাঁর ছবিতে ক্যামেরা থাকে অনড়। Tracking Shot যদি বা কদাচিৎ চোখে পড়ে, তাও সেটা প্রচলিত কারণে ব্যবহার হয় না। ছন্দ বা গতির বৈচিত্র্যের যে ধারণা এতদিন দেশ-বিদেশের ছবি দেখে আমাদের মনে হয়েছে, ওজুর ছবিতে তার কোন পরিচয় নেই। দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্বের তারতম্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু ক্যামেরার অবস্থান সব সময়ই মেঝে থেকে দু' হাত উপরে। অর্থাৎ জাপানী কায়দায় মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসলে মানুষের চোখ যেখানে থাকে, ওজুর ক্যামেরার লেন্স থাকে প্রতিটি শট্-এ ঠিক সেই উচ্চতায়। ফলে সব মিলিয়ে ওজুর ছবির দৃশ্যগত দিকটায় এমন একটা সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়, যেটা সাধারণ দর্শকের পক্ষে রীতিমত ক্লান্তিকর মনে হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ এ সত্ত্বেও ওজুর ছবি চলচ্চিত্র নয় এ কথা বলা চলে না, কারণ, প্রথমত, তাঁর ছবিতে অভিনয় আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ; দ্বিতীয়ত ওজুর কাহিনীর চরিত্রগুলিকে সব সময়ই রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় এবং এইসব চরিত্রের প্রকাশ হয় বাস্তবধর্মী ডিটেলের সাহায্যে। এককভাবে মনের বিকাশ ও একাধিক চরিত্রের পরস্পরের মৃদু সংঘাত ওজুর ছবিতে এক ধরনের আভ্যন্তরীণ গতি সঞ্চার করে। এই গতি একমাত্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বস্তু এবং এহেন গতিও যে চলচ্চিত্রে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম তা একমাত্র ওজুর ছবি দেখলেই বোঝা যায়।

৫

আজ থেকে দশ বছর আগে তরুণ ফরাসী পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তাঁর ছবি 400 Blows-এর শেষ দৃশ্যের শেষ শট্-এ প্রথম freeze ব্যবহার করেন। এর আগে এই রীতি অন্য কোন ছবিতে ব্যবহার হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই, কিন্তু সে-ব্যবহার যে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ছবি করার আগে ত্রুফো ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত ফিল্ম পত্রিকা Cahiers du Cinema-র সমালোচক গোষ্ঠীর একজন। বহুকাল ধরে নানান দেশের ভালো-মন্দ ছবি দেখে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক Andre Bazin-এর সংস্পর্শে এসে ত্রুফোর বনিয়াদটা হয়েছিল পাকা। গোদার, শাব্রল, রিভেৎ ইত্যাদিও এই একই পরিবেশে তাঁদের চলচ্চিত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই কয়েকজনের নেতৃত্বেই নিউ ওয়েভের সূচনা।

400 Blows-এর ভাষায় একটা চমৎকার সহজ সাবলীলতা আছে। ছবির প্রথম দিকে মাঝে মাঝে অন্যান্য বিখ্যাত ফরাসী পরিচালকের কথা মনে পড়ে যায়—যেমন রেনোয়া বা ক্লেয়ার বা বেকার। ছবির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় এর দ্বিতীয়ার্ধে। এখানে ত্রুফো যে কেবল সিনেমার পূর্বপ্রচলিত রীতি থেকেই রসদ সংগ্রহ করছেন তা নয়; টেলিভিশনের কিছু কিছু রীতিকেও তিনি কাজে লাগাচ্ছেন। ছবির প্রধান চরিত্র একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলে। তার দুরন্তপনায় নাজেহাল হয়ে তাকে তার বাবা-মা সংশোধনাগারে ভর্তি করে দিলেন। এখানে ছেলেটিকে জেরা করার একটি দৃশ্য আছে, যাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ত্রুফো

চিত্রনাট্য-নির্ভর মুখস্থ করা সংলাপ ব্যবহার করছেন না, দৃশ্যটি নেবার সময় ক্যামেরার সামনে তখন তখন বানিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং ছেলেটি সরাসরি নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। ফলে ছেলেটির মুখে যে বিশেষ অভিব্যক্তিটি ফুটে বেরিয়েছে, সেটা সিনেমার প্রচলিত রীতিতে প্রায় অসম্ভব ছিল। ছেলেটির এই সংলাপের সঙ্গে কাহিনীর বিন্যাসের কোন যোগ নেই, বা যোগ থাকার প্রয়োজনও নেই। যে-সংলাপ ঘটনা বিন্যাসের কাজে ব্যবহার হবে, সে সংলাপ তৈরি-সংলাপ না হলে মুশকিল। কিন্তু ত্রুফোর এ-দৃশ্যে ছেলেটি নিজের কথা নিজের ভাষায় বলার ফলে সংলাপের একটি কর্তব্য—অর্থাৎ চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা—চমৎকার ও অভিনব ভাবে পালন করেছে।

400 Blows-এর শেষ দৃশ্য তাকে সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যেতে দেখানো হয়েছে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে সে সমুদ্রের উদ্দেশে। সে শুনেছে স্কুলের কাছেই সমুদ্র আছে এবং তার ধারণা সমুদ্রে পৌঁছালেই তার সব সমস্যার শেষ হবে।

প্রায় চার মিনিটব্যাপী এই দৌড়ের দৃশ্য একটিমাত্র Tracking Shot-এ নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছালে পর শট্ পরিবর্তন হয়। এবার ছেলেটির সঙ্গে ক্যামেরা 'প্যান' করে (অর্থাৎ হাতল ধরে ঘুরিয়ে) দেখানো হয় সমুদ্রের ঢেউ যেখানে এসে আছড়ে পড়ছে, সেই পর্যন্ত এসে সে থেমে গেল। আর এগোনর পথ নেই। তাকে ফিরতে হবে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে উলটোমুখে ঘুরে ছেলেটি এবার যেন আমাদের দিকেই (অর্থাৎ ক্যামেরার দিকে) দৌড়ে আসে। দৌড়ের মাঝখানে হঠাৎ শট্‌টি freeze করে (অর্থাৎ স্থিরচিত্র হয়ে যায়)। এইভাবে দর্শকদের দিকে চেয়ে দৌড়ানোর ভঙ্গীতে স্থির অবস্থাতেই ছবি শেষ হয়।

বোঝাই যাচ্ছে, এখানে freeze-এর ব্যবহার শুধু চমকপ্রদই নয়, গভীরভাবে অর্থপূর্ণ বটে—যাকে বলা যায় stroke of genius। ছেলেটির যাবার আর কোন পথ নেই। সুতরাং সে যতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকারই সামিল। তার ছোটার ইচ্ছা এবং পরিচালকের 'ছুটে লাভ নেই' বলার ইচ্ছে একই সঙ্গে এই freeze-এ বলা হয়েছে। এখানে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকারও একটা মানে আছে। তবে মনে হয় যেন ছেলেটি বলতে চাইছে—তোমরাই—অর্থাৎ সমাজই আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী, তোমরাই ভেবে বার কর আমার মত ছেলের সমস্যা মিটবে কী করে :

Freeze জিনিসটা আজকাল অনেক ছবিতেই ব্যবহার হচ্ছে, তবে সব ক্ষেত্রে তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়। এখানে মানুষের হাসির সঙ্গে একটা উপমা দেওয়া চলতে পারে। কেউ যদি স্পষ্ট হাসির কারণে হাসে, তাহলে তার একটা মানে আছে। কেউ যদি হাসলে সুন্দর দেখায় বলে হাসে, তাহলে সেটা affectation বা অলঙ্কারের সামিল হয়ে দাঁড়ায়—কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া এ হাসির আর কোন অর্থ নেই ; আর কেউ যদি অকারণে আপন মনে হাসে, তাহলে সেটাকে মনোবিকারের লক্ষণ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় ; যদি বা এ-হাসির কোন মানে থাকে, তাও সে এতই ব্যক্তিগত ও গোপন যে সেখানে ভাবের আদান-প্রদানের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

Freeze-এর ব্যবহার যে সব সময় নাটকীয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বাস্তব জীবনের কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত বিশেষভাবে আমাদের মনে দাগ কাটলে আমরা অনেক সময়ই বলি 'একেবারে বাঁধিয়ে রাখার মত।' কথার ভাষায় যেটা কেবলই উপমা, সিনেমার ভাষা সেটাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারে Freeze-এর সাহায্যে। ত্রুফোর Jules et Jim যারা দেখেছেন, তারা এর একাধিক Freeze-এর ব্যবহার নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। একটা হাসির টুকরো, এক পলক চোখের চাহনি, একটা বিশেষ ছন্দোময় দৈহিক অভিব্যক্তি—এর অনেক কিছুই ত্রুফো Freeze করে এক এক মুহূর্তের জন্য বাঁধিয়ে রেখেছেন। এ ছবির Freeze-এর সঙ্গে 400 Blows-এর Freeze-এর অনেক তফাত। আর এটাও লক্ষণীয় যে ত্রুফোর পরের দিকের ভিন্ন মেজাজের ছবিতে Freeze প্রায় বর্জন করেছেন। (Le Peau Douce-এর সনাতনী ভাষা লক্ষণীয়)। আসলে Jules et Jim-এর ভাষা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তার বিষয়বস্তু থেকে অদ্ভুত; এ ছবির কেন্দ্রস্থ নায়িকা ক্যাথরিনের চরিত্রই সমস্ত ছবিটির গতিবিধি ও স্টাইল নির্ধারিত করেছে। ক্যাথরিন উগ্রভাবে স্বাধীন ও বেপরোয়া চরিত্র। সে সামাজিক রীতিনীতি মানে না। এক কথায় সে আনকনভেনশনাল। ত্রুফো যদি এই চরিত্রকে সমালোচনার উদ্দেশ্যে ছবি করতেন, তাহলে এ ছবি গতানুগতিক নাটকীয় পদ্ধতিতে বলা চলত। কিন্তু ত্রুফো এই চরিত্রটিকে ভালোবেসে ফেলে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়েই ছবিটি রচনা করেছেন। ফলে ছবিটির বিন্যাসের রীতিতে বারে বারে এই চরিত্রের ছাপ পড়েছে। অনেকে ত্রুফোর পরবর্তী ছবির ভাষায় Jules et Jim-এর কেরামতি না দেখে আপশোষ করেছেন যে ত্রুফো তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলছেন। আমার বিশ্বাস ত্রুফো মহৎ শিল্পী বলেই বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষভাবে ভাষার কোন কারসাজি দেখান না। আসলে ত্রুফোর প্রত্যেকটি ছবিতেই বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গীর আশ্চর্য সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

চিত্রভাষার ব্যাপারে বিপ্লবের পুরোধা হলেন জাঁ লুক্‌ গোদার। গোদারের বিষয় কিছু বলার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার। গত পনের বিশ বছর ধরেই পশ্চিমের শিল্প সাহিত্য সংগীতে একটা মেজাজের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান কারণবশতঃ প্রচলিত মূল্যবোধে একটা ব্যাপক ভাঙন মেজাজকে প্রভাবিত করেছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটা অনাস্থা, প্রচলিত নীতিবোধ সম্পর্কে একটা cynicism, নানানভাবে জীবনের ও শিল্পসাহিত্যের নানান স্তরে প্রকাশ পাচ্ছে। স্বভাবতই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী এই দুইয়ের উপরেই এর প্রভাব পড়ছে। দশ বছর আগেও ছবিতে যেসব ঘটনা গর্হিত বলে গণ্য ছিল, এখন আর তা নেই। কলাকৌশলের ব্যাপারে ছবি থেকে মোলায়েমত্ব দূর করার চেষ্টা চলছে। মেক-আপের রীতি, অভিনয়ের ঢং, ফোটোগ্রাফির আলোকসম্পাতের কায়দা, সংলাপ, এডিটিং ইত্যাদি সবকিছুই নতুন যুগের নতুন মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টা করছে। আবহসংগীতের ব্যবহারও ক্রমেই কমে আসছে। আগে হলিউডের ছবিতে প্রায় বারো আনাই আবহসংগীতে আপ্লুত থাকত। আজকাল ভাব প্রকাশের এই বিষয়বস্তু বহির্ভূত

সহজ উপায়টাকে বর্জন করে কেবলমাত্র বাস্তব ধ্বনির সাহায্যে ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। চলচ্চিত্র যে কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের সামগ্রী নয়, এটা যে একটা সিরিয়াস আর্টও বটে, এই তথ্য প্রচার করার জন্য অনেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। দর্শক প্রথমে বিচলিত হলেও, ক্রমে এই নতুন মেজাজে অভ্যস্ত হয়ে আসছে।

গোদার বা নিউওয়েভের আবির্ভাবের বেশ কিছু আগে থেকেই এই নতুন মেজাজের পূর্বাভাস কিছু ছবিতে পাওয়া গিয়েছিল। ইতালির নিও-রিয়ালিস্ট যুগে ডি সিকা, রসেলিনি, ডি সান্তিস ইত্যাদি পরিচালক রং-না-মাখা নতুন অভিনেতাদের নিয়ে স্টুডিও-র চত্বরের বাইরে রাস্তাঘাটের বাস্তব পরিবেশে গিয়ে ছবি তুলেছিলেন। এই বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সমাজ সচেতনতা মিশে চলচ্চিত্রের একটা নতুন চেহারা প্রকাশ পেয়েছিল। তবে এ যুগের কোন ছবিই চিত্রভাষা বা কাঠামোর দিক দিয়ে গতানুগতিকের বাইরে যেতে পারেনি। Bicycle Thieves বা Open City-র বাস্তব খোলস ছাড়িয়ে দিলে ভিতরে যে ঠাটটি প্রকাশ পায়, তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক নাটকের ঠাটের খুব বেশী পার্থক্য নেই। নিও-রিয়ালিজমের কিছু পরে পঞ্চাশ শতকের গোড়ার দিকের কিছু ছবিতে এই নতুন মেজাজ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আন্তোনিওনির Il Grido, বুনুয়েলের Nazarin ও ব্রেঁসর The Diary of a County Priest-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

ত্রুফোর মত গোদারও ছিলেন Cahiers du Cinema-র সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। সব যুগের সব জাতের ছবির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর সমালোচনার মধ্যে কনভেনশন সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব প্রায় প্রথম থেকেই প্রকাশ পেতো। আরো যেটা প্রকাশ পেতো সেটা তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং তাঁর সমাজসচেতন বামপন্থী মনোভাব।

গোদার তাঁর পরিচালনা শুরু করেন কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি দিয়ে। তার মধ্যে একটি ছোট গল্প—Every young man is called Patrick আমি দেখেছি। বোঝাই যায়, গোদার এ ছবি করেছিলেন হাত পাকানোর জন্য। এ-ছবির পরিচালনায় দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় আছে, আধুনিক মেজাজের ছাপও আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে বিদ্রোহের কোন লক্ষণ নেই। বহু প্রশংসিত Breathless হল গোদারের প্রথম বড় ছবি, এবং এই ছবি থেকেই গোদার কনভেনশন ভাঙা শুরু করলেন।

Breathless ছবির ভাষা বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হল—গোদারের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কম খরচে ছবি করা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবি করতে গেলে কতগুলি শিল্পবহির্ভূত নিয়ম মানতে হয় সেটা গোদারের খুব ভালো ভাবেই জানা ছিল। এসব নিয়ম গোদার মানতে রাজী ছিলেন না। অথচ ছবিতে ক্রমাগত লোকসান হলে অচিরে ছবি করার পথ বন্ধ হবে। গোদার তাই খরচ কমানোর নানান উপায় আবিষ্কার করলেন। কতগুলো ব্যাপার আছে—যেমন, ক্যামেরার ভাড়া বা ল্যাবরেটরির ভাড়া—যেখানে খরচ কমানোর রাস্তা নেই বললেই

চলে। ফিল্মের কাঁচামাল অতিরিক্ত ব্যয় করলে তাতে খরচ বাড়ে কিন্তু এক ধরনের টেকনিক্যাল পারফেকশনের চিন্তাটা যদি মন থেকে দূর করা যায়, তাহলে এ খরচটা কমানো যায়। অভিনেতা যদি পাকা হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম ফিল্মে কার্যসিদ্ধি হয়, কারণ অভিনয়ের ত্রুটি সংশোধনের জন্য বার বার একই শট নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। গোদার তাই আনকোরা নতুন লোক নিয়ে কাজ করার কথা চিন্তাই করলেন না। Breathless-এর নায়ক-নায়িকা দুজনেই পেশাদারী অভিনেতা-অভিনেত্রী।

তারপর, ছবি তোলার সময় কিছু যান্ত্রিক লটবহরের প্রয়োজন হয়, যেগুলো না হলে ছবিতে টেকনিক্যাল জৌলুস আনা সম্ভব নয়। যেমন Tracking Shot নেওয়া হয় মাটিতে লাইন পেতে তার উপর দিয়ে গাড়ি বা Trolley-তে ক্যামেরা চালিয়ে। এটা রীতিমত সময়সাপেক্ষ, এবং গাড়ি যাতে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে তার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এদিকে শুটিং-এর ব্যাপারে টাইম ইজ মানি; তাই গোদার Trolley-এ হ্যাঙ্গামে না গিয়ে ক্যামেরাম্যানের হাতে ক্যামেরা ধরিয়ে সেই অবস্থাতেই তাকে হাঁটিয়ে Tracking Shot নিলেন। ফলে ক্যামেরাম্যানের হাত কাঁপল, এবং এই কম্পন গৃহীত দৃশ্যে সঞ্চারিত হয়ে একটা অপরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি করল। কিন্তু গোদার সেটা গ্রাহ্য না করে পরের পর এই একই ভাবে শট নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত এই কম্পন তার স্টাইলের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মনে হল গোদার যেন বলতে চাইছেন যে এই ছবি জিনিসটা মেশিনে তৈরী নিষ্প্রাণ ছিমছাম কিছু নয়—এটা আসলে মানুষের হাতের কাজ, সুতরাং ছবিতে সেই হাতের ছাপ থাকাটা শিল্পের বিচারে গর্হিত কিছু নয়।

ডিজল্‌ভ ও ফেড জিনিসটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়, তাই এগুলোও ব্যয়সাপেক্ষ। গোদার তার ছবি থেকে এই দু'টি জিনিস প্রায় বাদ দিয়ে সরাসরি কাটের সাহায্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে গেলেন। উপন্যাসে যদি পরিচ্ছেদ বাদ দিয়ে পরস্পর অসংলগ্ন ঘটনাও একটানা লেখা হয়, তাহলে সাধারণ পাঠক হোঁচট খেতে বাধ্য। গোদারের ছবিতে jump cut-এর ব্যবহার প্রথম দিকে দর্শককে রীতিমত অস্থির করে তুলেছিল। ক্রমে এই jump cut-ও গোদারের ভাষার অঙ্গ হিস্যাবে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে খরচ বাঁচিয়ে যে ভাষা তৈরি হল, সেটা Breathless-এর আনকনভেনশনাল কাহিনীর সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল। যারা Breathless দেখেছেন তারা জানেন যে প্রেমের গল্প হয়েও গতানুগতিক মিলনান্ত প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে এর কত তফাত।

যে আধুনিক মেজাজ গোদারের প্রথম ছবিতেই ব্যক্ত, সেই মেজাজ ক্রমে তার একের পর এক ছবিতে আরো স্পষ্ট ও আরো রূঢ় চেহারা নিয়েছে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে গোদার ছবিতে আধুনিক কাব্য এনেছেন, দরদ এনেছেন, এবং সেই অনুযায়ী ছবির ভাবাও কিছুটা বদল হয়েছে, সরল হয়েছে—যেমন Pierrot le Fou বা Masculin Feminin-এ দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই যে মেজাজটা পাওয়া যায় সেটায় সর্বত্র একটা উগ্র-আধুনিকতার ছাপ রয়েছে—এবং সেটা যেমন বিষয়বস্তুতে, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গীতে। এই প্রকাশভঙ্গীতে শুধু যে

সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা বা নাটকের উপাদান রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে রয়েছে টেলিভিশন, খবরের কাগজের রিপোর্ট, বিজ্ঞাপনের ভাষা, প্রবন্ধের ভাষা, পপ আর্ট ইত্যাদির প্রভাব। এই জগাখিচুড়ি সত্ত্বেও গোদারের ছবি প্রধানত দুটি গুণে শিল্প হিসাবে সার্থক। এক হল আজকের রিয়্যালিটি সম্পর্কে এক আশ্চর্য স্পষ্ট ধারণা; এবং দ্বিতীয় হল, পরস্পর আপাতবিরোধী চিত্রভাষাকে একই ছবিতে সমন্বিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা। ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে এটা সম্ভব নয়। আর এটাও লক্ষ করার বিষয় যে তার একই ছবিতে একই বিষয় নিয়ে নানান ভাষায় নানান কথা বললেও সব সময়েই বোঝা যায় যে এটা বৈদগ্ধ ও wit-এর পরিচয়, মনোবিকারের নয়।

গোদারের ছবি সহজবোধ্য নয়। কিন্তু সেটা গোদারের দোষ নয়। পঞ্চাশ বছর ধরে যে মনোভাব সিনেমাকে আর্থিক লোকসানের ভয় দেখিয়ে least resistance-এর পথে নিয়ে গেছে, এবং দর্শককেও সেই পথে চলতে বাধ্য করেছে, এটা তারই দোষ।

বিদেশের অনেক পরিচালকই আজকাল গোদারেরই মত আধুনিক জীবনের সমস্যা নিয়ে ছবি তুলছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরা প্রায় সকলেই গোদারের অন্ধ অনুকরণ করছে। এদের না আছে গোদারের পাণ্ডিত্য, না আছে তার wit, না আছে চলচ্চিত্রের কনভেশন সম্পর্কে ধারণা। শেষোক্ত গুণটি প্রয়োজন এই কারণেই যে, শিল্পে যদি কোন নিয়ম ভাঙতে হয়, তাহলে সে নিয়ম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা, এবং পুরনোর জায়গায় নতুন কী নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ ধারণা গোদারের অনুকরণকারীদের কারুর আছে বলে মনে হয় না।

বিদেশে এখনো অনেক পরিচালক রয়েছেন যাঁরা গোদারের উগ্র-আধুনিক ভাব ব্যবহার না করেও যুগোপযোগী সার্থক ছবি করছেন। এদের সম্বন্ধে কোন সমঝদার এখনো ওল্ডফ্যাশনড্ কথাটা প্রয়োগ করেননি। এই প্রসঙ্গে ইউরোপের বার্গম্যান, আন্তোনিওনি, বেলোকিও, ওলমি, প্যাসোলিনি, বুনুয়েল, ফরম্যান, জাঙ্কশো ইত্যাদি, এবং জাপানের তেসিগাহারা, ইচিকাওয়া ইত্যাদির নাম করা যায়। এঁদের সকলেই যে তাঁদের ছবি থেকে প্লট বা নাটক বর্জন করেছেন তা নয়। বা এমনও নয় যে এঁরা সকলেই দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছেন। এঁদের অনেকেরই আধুনিকতা ছবির বহিরঙ্গে তেমন স্পষ্ট নয়। সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, বা বিশেষ মেজাজের মধ্যে পরিস্ফুট। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ গোদারের বিদ্রোহী মনোভাব সব পরিচালকই পোষণ করবেন এমন কোন কথা নেই—এবং বিদ্রোহই আধুনিকত্বের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। চলচ্চিত্রের মতো এমন শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্প যদি হঠাৎ এক ধাঁচে এক সুরে কথা বলতে শুরু করে তাহলে সেটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হবে। শিল্পীর স্বাধীনতা যতদিন বজায় থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত একই পরিবেশ, একই বিষয়বস্তু, বিভিন্ন অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীর মনে বিভিন্ন অনুরণনের সৃষ্টি করবে, ততদিন পর্যন্ত একই যুগে একই শিল্পী বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন পোশাকে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য।

দেশ. বিনোদন: ১৯৬৯

সোভিয়েত চলচ্চিত্র

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের কথা বলতে গেলে প্রথমে প্রাক্‌-বিপ্লব রুশ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রায় একই সময় ছায়াচিত্রের জন্ম হয়। জনসাধারণের মনে এই চলমান ছবি প্রচণ্ড বিস্ময় ও উদ্দীপনার উদ্রেক করেছিল। ফলে ব্যবসা হিসেবে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবিষ্কর্তাদের মনে কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না। এঁরা তাই দেশ বিদেশে ছায়াচিত্র দেখিয়ে এই স্বর্ণপ্রসূ আবিষ্কারের মহিমা প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

যে বছরে দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের অভিষেক হয়, সেই ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের লুমিয়ের কোম্পানি মস্কোতে প্রথম সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শনের আয়োজন করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংলণ্ডের রবার্ট পলের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস এডিসনের ছায়াচিত্র রাশিয়ায় দেখানো হয়। এর ফলে রুশ জনসাধারণ—এবং সেই সঙ্গে নিকোলাইও—ছায়াচিত্রের মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

প্রথম ছায়াচিত্রের দর্শকদের মধ্যে রাশিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তিরাও কেউ কেউ ছিলেন। ভ্লাদিমির স্তাসোফ ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সংগীত সমালোচক। এডিসনের তোলা চলন্ত রেলগাড়ির ছবি তাঁকে অ্যানা কারেনিনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এই আদিম চলচ্চিত্র সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির মতামত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোর্কি বলেন, 'আজকের দিনের মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা থেকে বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করে না। কিন্তু এই সব সাধারণ ঘটনাই চলচ্চিত্রে এক ঘনীভূত নাটকীয় রূপ ধারণ করে সেই একই মানুষের মনকে নাড়া দেয়। ভয় হয় একদিন হয়তো এই চলচ্চিত্রের জগৎ বাস্তব জগৎকে অতিক্রম করে মানুষের হৃদয় মন অধিকার করে বসবে।'

সে-যুগে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল ঘনিষ্ঠ। তাই গোমো, পাথে ইত্যাদি ফরাসী ছায়াচিত্র কোম্পানি অল্পদিনের মধ্যেই রাশিয়ার বাজার দখল করে বসল। তখনকার অধিকাংশ ছবিই ছিল বাস্তব ঘটনামূলক, অর্থাৎ এখন যাকে নিউজরীল বলা হয় সেই জাতীয়। ক্রমে উপন্যাস ও

নাটকের উপর ভিত্তি করে ছবি তোলা শুরু হল, এবং সিনেমার জনপ্রিয়তা অনেক গুণে বেড়ে গেল।

১৯০৩ সালে রাশিয়াতে ফরাসী ছবির পরিবেশনের ব্যবসায় যোগ দিলেন প্রথম রুশ পরিবেশক গুট্‌সমান্। গুট্‌সমানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একে একে অনেক রুশ ব্যবসাদার চিত্র পরিবেশনের কাজে নেমে পড়লেন।

এর পরের তিন বছর রুশ-জাপান যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ইত্যাদি সত্ত্বেও চলচ্চিত্র ব্যবসা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। ১৯০৭ সালে আলেকজান্দার দ্রাঙ্কফ্ প্রথম রুশ প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার পরের বছর দ্রাঙ্কফ্ প্রযোজিত প্রথম রুশ ছবি 'স্টেঙ্কা রাজিন' প্রদর্শিত হল এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করল। দ্রাঙ্কফ্ ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খানজঙ্কফ্ বেশ কিছুদিন ধরে রুশ ছায়াচিত্রের বাজারে নেতৃত্ব করেন। দ্রাঙ্কফদের কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তলস্তয়কে ক্যামেরার সামনে উপস্থিত করা। স্থিরচিত্র তোলানোর ব্যাপারেই তলস্তয়ের আপত্তি ছিল যথেষ্ট, সুতরাং সিনেমাটোগ্রাফ তোলানোর প্রস্তাবে তিনি যে প্রথমে নারাজ হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু চলন্ত ছবির নমুনা দেখে তিনি রীতিমত উৎসাহিত বোধ করেন। তাঁর মত ছিল, রুশ চলচ্চিত্রকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত কাল্পনিক কাহিনী বর্জন করে সাধারণ রুশ কৃষকের বাস্তব জীবন ছায়াচিত্রে বর্ণিত করা।

প্রথম মহাযুদ্ধ ব্যবসার দিক দিয়ে রুশ চলচ্চিত্রের ক্ষতি তো করেই নি, বরং ইউরোপীয় ছবির আমদানি বন্ধ করে দিয়ে দেশজ ছবির সম্প্রসারণের পথ সহজ করে দিয়েছিল। উনিশ শ' সাতের প্রথম রুশ ছবি থেকে শুরু করে বিপ্লবের আগে পর্যন্ত দ্রাঙ্কফ্ ও খানজঙ্কফ্ ছাড়া যাঁরা রুশ চলচ্চিত্রের ক্রমপরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যুগ্ম প্রযোজক থীমান ও রাইনহার্ট, পরিচালক গনচারফ, প্রোতাজানফ ও ইয়েভগেনি বাউয়ের, সাহিত্যিক ও নাট্যকার লিওনিদ আন্দ্রেইয়েফ, নাট্য প্রযোজক মায়ারহোল্ড ও বিপ্লবী কবি মায়াকভ্স্কির নাম উল্লেখযোগ্য।

রুশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে কজন চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং সেই বিশ্বাসে চিত্র-নির্মাণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তার মধ্যে আন্দ্রেইয়েফের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানিতে অ্যাপোলিনেয়র, দান্নুনৎসিও, গের্হার্ট হাউপ্টমান প্রমুখ অগ্রণী সাহিত্যিকেরা চলচ্চিত্রের কাজে যোগ দিতে দ্বিধা করেন নি। আন্দ্রেইয়েফ চেয়েছিলেন রুশ শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও উন্নাসিকতা বর্জন করে চলচ্চিত্রের কাজে এগিয়ে আসুক। আন্দ্রেইয়েফের প্ররোচনায় একাধিক সাহিত্যিক চিত্রনাট্যকার হিসেবে বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রযোজকদের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে এসব চিত্রনাট্যের কোনটাই অবিকৃতভাবে পর্দায় পৌঁছতে পারেনি।

১৯১৩ সালে মায়াকভস্কির প্রথম চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতারও পরিসমাপ্তি হল করুণভাবে। তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্য শুনে প্রযোজক পার্সকি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। অথচ কিছুদিন পরে এই পার্সকি প্রযোজিত একটি ছবিতে মায়াকভস্কি তাঁর চিত্রনাট্যের প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন।

আধুনিক মঞ্চরীতির অন্যতম পথিকৃৎ মায়ারহোল্ড ১৯১৪ সালে অস্কার ওয়াইল্ডের 'পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' থেকে একটি ছায়াচিত্র রচনা করেন। এ ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মতে নির্বাক চিত্রের ইতিহাসে ডোরিয়ান গ্রে অভিনবত্বে জার্মানির 'কালিগারি'র সঙ্গে তুলনীয়।

দুঃখের বিষয় রুশ নাট্যজগতের অন্যতম শিরোমণি কনস্তান্তিন স্তানিসলাভ্স্কি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন।

জুরিখে নির্বাসনকালে সারাদিনের কাজের পর লেনিন প্রায়ই সন্ধ্যাটা কাটাতেন সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে। এটা যে কেবল অবসর বিনোদনের জন্য তা নয়। লেনিনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদ-চিত্র দেখে সেই সব দেশের জনসাধারণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আচার ব্যবহার লক্ষ করা। ছায়াচিত্র যে মানুষের জ্ঞানের পরিধি আশ্চর্যভাবে প্রসারিত করতে পারে, একথা লেনিন জুরিখে থাকতেই বুঝেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে একটা প্রবল দেশাত্মবোধ সমস্ত রাশিয়াতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এর প্রতিফলন রুশ ছায়াচিত্রেও লক্ষ করা গিয়েছিল। রাশিয়ার জয় হোক, জার্মানি নিপাত যাক—এই ছিল যুদ্ধের প্রথম বছরের রুশ ছবির বিষয়বস্তু। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে যখন দেশে অরাজকতা শুরু হল, জার্মান ও অস্ট্রিয় সৈন্য তাদের লুপ্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল, এবং তারও পরে যখন যুদ্ধ সম্পর্কে অনীহা এবং জারীয় শাসননীতিতে গভীর অনাস্থা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হতে লাগল, তখন এই ব্যাপক ভাঙনের চেহারাটাও যেন রুশ চলচ্চিত্রে দেখা গেল।

'Not normal men and women, but devils, ascetics, vampires people the films of the Russian winter of 1916' (Jay Leyda) অথচ ফিল্ম-ব্যবসায় মন্দার কোনো প্রশ্ন তখনও ওঠে না। প্রযোজনা ও পরিবেশনের কাজ করছে একশ' চৌষট্টিটি চালু কোম্পানি, চল্লিশ লক্ষ রুবলের উপর মূলধন খাটছে ফিল্ম ব্যবসায়। আসলে যেটার অভাব ছিল সেটা হল শৃঙ্খলা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা।

১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের ফলে চলচ্চিত্র-কর্মীদের মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট সে-আশাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করল। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রুশ ইতিহাসের গতি ও পরিণতির বিবরণ এখানে অবান্তর, তবে এটা বলা দরকার যে অক্টোবরের এক মাস আগেই একটি জরুরী শ্রমিক-সম্মেলনে, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই এ-সম্মেলনের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল চলচ্চিত্র। বিপ্লবোত্তর শ্রমিক-শিল্প-সংঘ প্রোলেটকাল্টের সূত্রপাত এই সম্মেলনেই।

বিপ্লবে বলশেভিক দলের জয় যখন অবধারিত, তখন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে বহু ব্যালে ও চলচ্চিত্র শিল্পী রাশিয়ার দক্ষিণে বলশেভিক অধিকৃত এলাকার বাইরে গিয়ে ডেরা বাঁধেন। আরো পরে, এই সব জায়গা ছেড়ে তাঁদের পশ্চিমে, অর্থাৎ ইউরোপে এবং আমেরিকায় গিয়ে পড়তে হয়। এঁদের মধ্যে অবশ্য সাধারণ কর্মীর চেয়ে প্রযোজক, পরিচালক, ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাই বেশি ছিল। এঁদের অনেকেই আর দেশে ফেরেননি, অথচ বিদেশে গিয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুব কম।

সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র ব্যবসার জাতীয়করণের ঘটনাকাল হল আগস্ট ১৯১৯। অক্টোবর ১৯১৭ থেকে আগস্ট ১৯১৯-এর মধ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এক হল, প্রথম সরকারী সিনেমা কমিটির উদ্ভব। দ্বিতীয়, শিক্ষা বিভাগের অধীনে ক্রুপ্স্কায়ার তত্ত্বাবধানে একটি চলচ্চিত্র উপ-বিভাগ গঠন। সিনেমার দিকে সরকারের একটা দৃষ্টি চিত্রব্যবসায়ীদের মনঃপূত হল না। ফলে মস্কো থেকে আরো কিছু চিত্র-প্রযোজক যন্ত্রপাতি সমেত দক্ষিণে পলায়ন করলেন। স্বভাবতই এর ফলে একটা সংকটাপন্ন অবস্থার উদ্ভব হল। অবশেষে সরকার একটি আইন জারী করে এই পলায়নের পথ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন এবং তারপর আরেকটি নতুন কমিটি তৈরি করে প্রযোজকদের চিত্রনির্মাণে উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করলেন। সিনেমা কমিটির প্রথম দিকের ইস্তাহারগুলিতে চলচ্চিত্রের শিল্পের চেয়ে শিক্ষার দিকটাতেই বেশি জোর দেওয়া হত। শিল্পের দিকটা দেখতেন পরিচালক নিজেই।

মায়াকভস্কি আগে যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে তিনি সে-সুযোগ পেলেন। পর পর চারখানা চিত্রনাট্য তিনি মস্কোর নেপচুন কোম্পানির জন্য লিখলেন। শুধু তাই নয়—এর একটিতে (জ্যাক লণ্ডনের মার্টিন ইডেনের চিত্ররূপ) তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন। কিন্তু পরিচালনার দুর্বলতা হেতু, মায়াভস্কির মতেই চারখানার একখানা ছবিও উৎরোয়নি।

১৯১৮ সালের পয়লা মে-তে মস্কোর রেড স্কোয়ারে প্রথম মে-দিবস উৎসবের ছবি তুলতে সিনেমা কমিটি এক তরুণ আলোকচিত্র-শিল্পীকে নিযুক্ত করলেন। এঁর নাম এদুয়ার্দ তিসে। উত্তরকালে আইজেনস্টাইনের ক্যামেরাম্যানরূপে ইনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন।

সেই বছরই জুন মাসের সাতাশ তারিখে প্রথম সোভিয়েত কাহিনীচিত্র 'সিগন্যাল' প্রদর্শিত হয়। ছবির পরিচালকের নাম ছিল আলেকজান্দার আর্কাতফ। এর কিছুদিন পরেই Agit-Train-এর সূচনা। এই অ্যাজিটট্রেনে ছিল খবরের কাগজ ও হ্যাণ্ডবিল ছাপার ব্যবস্থা, নতুন নাটক লেখার ও অভিনয় করার দল ও ফিল্ম তৈরি করার জন্য কর্মী ও সরঞ্জাম। ট্রেনের গন্তব্যস্থল ছিল রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত। রেড আর্মি তখন চেক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এই রেড আর্মির সৈন্যদের উদ্দীপিত করবার জন্যই অ্যাজিটট্রেনের সৃষ্টি। এই ট্রেনের চলচ্চিত্র কর্মীদের পুরোভাগে ছিলেন এদুয়ার্দ তিসে। যা ছবি তোলা হতো, তার সম্পাদনার ভার নিতে এগিয়ে এসেছিলেন বিংশতি বর্ষীয় তরুণ কবি জিগা-ভের্তফ্।

সোভিয়েত সরকারের শিক্ষাপ্রচারের ব্যাপক উদ্যোগ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্যাকসিম গোর্কি নিজে থেকে এগিয়ে এসে একটি বক্তৃতা মারফৎ চলচ্চিত্র ও নাটক সম্পর্কে কতগুলি প্রস্তাব করেন। এই দুই শক্তিশালী শিল্প-মাধ্যমের সাহায্যে মানব সভ্যতার ইতিহাস কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত করা যেতে পারে, বক্তৃতায় তিনি সেই কথাই বলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, যন্ত্রপাতি, লোকবল ও অর্থবলের দিক দিয়ে সোভিয়েত চলচ্চিত্র তখনও এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি যাতে গোর্কির এই মহান পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপদান করা সম্ভব হয়। গোর্কি-পরিকল্পিত পঁচিশটি চিত্রনাট্য তাই কাগজের পৃষ্ঠাতেই রয়ে গিয়েছিল।

৩

সোভিয়েত চলচ্চিত্র জাতীয়করণের কিছুদিন পরেই একটি মার্কিন ছবি রাশিয়াতে মুক্তিলাভ করে এবং সোভিয়েত জনসাধারণ ও চলচ্চিত্র কর্মীদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। ছবিটি হলো গ্রিফিথ পরিচালিত 'ইন্‌টলারেন্স'। পরে গ্রিফিথের অন্যান্য ছবিও রাশিয়াতে ব্যাপকভাবে দেখানো হয়। সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের উপর গ্রিফিথের প্রভাব আইজেনস্টাইনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন।

আইজেনস্টাইন ১৯১৮ সালে পেত্রোগ্রাদে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে রেড আর্মিতে যোগ দেন, সেই সময় অ্যাজিট-ট্রেনে ব্যবহারের জন্য কিছু প্রচার-চিত্র তিনি এঁকেছিলেন। যুদ্ধের পরে এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে ফিরে এসে আবার কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল ছেড়ে প্রোলেটকাল্টে যোগ দিয়ে তিনি সোভিয়েত শিল্পের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে একটি সরকারী চলচ্চিত্র শিক্ষায়তন সূচিত হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে কিছু প্রাক্-বিপ্লব চলচ্চিত্র কর্মীদের সঙ্গে রয়েছেন অ্যাজিটট্রেনের অন্যতম ক্যামেরাম্যান লেভ কুলেশফ।

এই শিক্ষায়তনের প্রথম মে-দিবস উৎসবে আমরা সোভিয়েত চলচ্চিত্রের আরেকজন ভবিষ্যৎ দিক্‌পালের সাক্ষাৎ পাই। এঁর নাম সেভোলোড পুদোভকিন। পুদোভকিন ছিলেন রাসায়নিক। গ্রিফিথের 'ইন্‌টলারেন্স' দেখে উৎসাহিত হয়ে ইনি চলচ্চিত্রের কাজে এগিয়ে আসেন। এঁর হাতেখড়ি হয় অভিনেতা হিসাবে।

একে একে এগিয়ে এসে সিনেমার কাজে যোগ দিয়ে যাঁরা সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন, উপরোক্ত তিন জন ছাড়া তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলেকজান্দার দোভচেঙ্কো, গ্রিগোরি কোজিনৎসেফ, লিওনিদ ত্রাউবের্গ, সের্গেই ইউৎকেভিচ, মিখায়েল চিয়াউরেলি, ফ্রীডরিশ এর্মলের, সের্গেই ভাসিলিয়েফ, মিখাইল কালাতোজোফ। বিপ্লবের পরের কয়েকটা বছর স্বভাবতই রুশবাসীদের একটা সংকটময় অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে চিত্রনির্মাণের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের একান্ত অভাব দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিকারকল্পে লেনিন একটি নতুন অর্থনৈতিক পন্থার (NEP) প্রবর্তন করলেন যার ফলে বাণিজ্যের পথ কিছুটা সুগম হলো। কিন্তু তার পরেই দেখা দিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। চিত্রপ্রযোজকেরা দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে দুর্ভিক্ষের

ছায়াচিত্র তুলে সারা দেশে দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। এই জাতীয় তিনখানা ছবি পর পর তোলা হয়। তার মধ্যে একটির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন পুদোভকিন। আরেকটি ছবি—The Famine in Russia—তুলেছিলেন নরউইজীয় পর্যটক ডা: ফ্রিট্‌জফ ন্যানসেন। এ ছবি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় দেখানোর ফলে রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক সহানুভূতি উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিল।

এর পরে ক্রমে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে স্বশাসিত চলচ্চিত্র বিভাগ স্থাপিত হতে থাকে। জর্জিয়া ও ইউক্রেনের স্টুডিওতে নতুন উদ্যমে ছবি তোলা শুরু হয়। স্টেট ফিল্ম স্কুলে কুলেশভের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলতে থাকে। পুদোভকিনও এই সময় কুলেশভের সঙ্গে যোগ দেন।

লেনিন বলেছিলেন যে নবগঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রে কাল্পনিক কাহিনীমূলক ছবির চেয়ে বাস্তবভিত্তিক ছবির মূল্য অনেক বেশি। সাম্যবাদী আদর্শ ও সোভিয়েত জীবনযাত্রার বাস্তবরূপ প্রচারের জন্য ১৯২২ সালের মে মাসে 'কিনো-প্রাভ্‌দার' সূচনা হয়। কিনো-প্রাভ্‌দা ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র সংস্করণ। অ্যাজিট-ট্রেনের জিগা-ভের্তফের তত্ত্বাবধানে এই সংবাদচিত্র তোলা হতো। কিনো-প্রাভ্‌দাকে আজকের দিনের সাপ্তাহিক নিউজরীলের জনক বলা চলে।

যাবতীয় সোভিয়েত ফিল্ম-পত্রিকারও আবির্ভাব হয় এই সময়েই। 'কিনো' 'ফোটো-কিনো' ইত্যাদি পত্রিকা প্রায় একই সময় আত্মপ্রকাশ করে। 'কিনো-গাজেতা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়ে আজও পর্যন্ত টিকে আছে।

আইজেনস্টাইন প্রোলেটকাল্টের পক্ষ থেকে এই সময় অস্ত্রভ্‌স্কির Enough Simplicity in Every Wise Man নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকেরই অংশ হিসেবে Glumov's Film Diary নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক টুকরো আইজেনস্টাইনকে তুলতে হয়েছিল। এটাই ছিল চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইনের হাতেখড়ি।

১৯২৩-এর ১৭ই আগস্টের একটি ইস্তাহারে সমস্ত বেসরকারী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে সোভিয়েত সরকার প্রযোজনা ও পরিবেশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। এর পরেই নির্বাক সোভিয়েত চলচ্চিত্রের সুবর্ণ যুগের শুরু। আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ছবির সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যে কটি ছবি এই সুনামের জন্য দায়ী তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কুলেশভের ব্যঙ্গাত্মক The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks, পুদোভকিনের দুখানা ছবি Death Ray ও Mechanics of the Brain, ভের্তফের বাস্তবভিত্তিক চলচ্চিত্রমালা Kino-Eye ও আইজেনস্টাইনের Strike.

কুলেশভ Mr. West রচনা করেছিলেন প্রধানত চলচ্চিত্র অভিনয় সম্পর্কে তাঁর কতগুলি মৌলিক থিওরি যাচাই করার জন্য। প্রাক্-বিপ্লব রুশ ছবিতে যে অভিনয় রীতি ব্যবহার হতো তা ছিল রঙ্গমঞ্চের রীতি। মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিকে চলচ্চিত্রেও দুর্লঙ্ঘ্য বলে মেনে নেওয়া হতো। কুলেশভের বিশ্বাস ছিল

সিনেমার অভিনয়রীতি হওয়া উচিত একেবারে স্বতন্ত্র এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অভিনেতাদের দিয়ে নতুন ধরনের অভিনয় করিয়ে Mr. West-এ কুলেশভ ষোল আনা সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

পুদোভকিনও তাঁর প্রথম ছবি Death Ray-তে কতকগুলি নতুন জিনিসের প্রবর্তন করেন। চলচ্চিত্রে জনসমাবেশের দৃশ্য সুষ্ঠুভাবে দেখাতে হলে এই জনতাকে দিয়েও যে সংঘবদ্ধ ভাবে অভিনয় করানো দরকার, এটা পুদোভকিনই প্রথম প্রমাণ করলেন। তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের দৃশ্যে এই ছবিতে পুদোভকিনই প্রথম অভিনেতাদের শ্রমিক সাজানোর রীতি বর্জন করে আসল শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেন।

জিগা-ভের্তফ 'কিনো আই'তে প্রমাণ করলেন যে ক্যামেরা যদি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, এবং সুনির্বাচিত ডিটেলের সাহায্যে সেই বাস্তবের স্বরূপ উন্মোচন করতে পারে, তবে চলচ্চিত্র লোকচিত্ত জয় করার জন্য সাজানো গল্পের অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, হালফিলের Cinema Verite রীতির সঙ্গে চল্লিশ বছর আগের কিনো আই রীতির কোনো প্রভেদ নেই। এখানে ভের্তফের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

'It is necessary to get out of this limited circle of ordinary vision : reality must be recorded not by imitating it, but by broadening the range ordinarily encompassed by the human eye.'

Strike ছবিতে আইজেনস্টাইন সোভিয়েত চলচ্চিত্রে বিপ্লব আনলেন। তথাকথিত প্লট বা কাহিনীর অনুপস্থিতি, কেন্দ্রস্থ কোনো নায়ক চরিত্রের অনুপস্থিতি—এসব ছিল তখনকার যুগে অভাবনীয়। Strike-এর বিষয়বস্তু হলো একটি প্রাক্-বিপ্লব ধর্মঘট—কীভাবে সে ধর্মঘটের সূত্রপাত হলো এবং কীভাবে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগ করে ধর্মঘট ভেঙে দিলেন। এই সরল কাঠামো অবলম্বন করে সুনির্বাচিত টাইপ চরিত্র দৃশ্যপট ও ডিটেলের সাহায্যে এবং সম্পাদনা ও দৃশ্য পরিকল্পনার কৃতিত্বে আইজেনস্টাইন Strike ছবিতে আশ্চর্য নাটকীয় আবেগের সঞ্চার করলেন। আইজেনস্টাইন যে সম্পাদনা রীতির উদ্ভব করেছিলেন তাকে তিনি 'Montage of Attractions' আখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে, ছবির প্রতিটি শট্-এ এমন উপাদান থাকবে যা এককভাবে, এবং তার পূর্বের ও পরের শট্-এর সঙ্গে সংযুক্তভাবে, দর্শকের মনকে ক্রমাগত আকৃষ্ট চমকিত ও উদ্বেলিত করবে।

এর পরের বছর ছিল ১৯০৫-এর বিপ্লবের বিংশতিতম স্মৃতি উৎসব পালনের বছর। আইজেনস্টাইন ততদিনে প্রোলেটকাল্ট ছেড়ে চিত্রপরিচালক হিসেবে মস্কোর একটি স্টুডিওতে যোগদান করেছেন। ১৯০৫-এর ঘটনাবলী চিত্রায়িত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল। এবং এই ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে রচিত একটি চিত্রনাট্যও তাঁকে দেওয়া হল। '১৯৩৫' চিত্রনাট্যই শেষ পর্যন্ত 'পোটেমকিন'-এর রূপ নিল। এই বিশ্ববিশ্রুত বহুবিশ্লিষ্ট ছবির ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ তথ্য প্রকাশ করা দরকার যে সোভিয়েত বিদগ্ধজনের উচ্ছ্বাস লাভ করলেও,

পোটেমকিনের অনুমোদন লাভ করতে আইজেনস্টাইনের বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। ১৯২৬ সালে বার্লিনে দেখানোর ফলে জার্মান দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভের পর ছবিটি রাশিয়ায় প্রথম ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়।

এই একই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ছবি হলো গোর্কির উপন্যাস অবলম্বনে পুদোভকিনের 'মাদার'। পোটেমকিনের মতোই, 'মাদার' সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। মাদার ও পোটেমকিনের তুলনামূলক বিচারে এই দুই মহান চিত্র-পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আইজেনস্টাইনের আঙ্গিকে জ্যামিতিক ছকের আভাস সুস্পষ্ট। এর ফলে বিষয়বস্তুর মানবিক দিকটা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সরল, সবল এবং ঋজুভাবেই উপস্থাপিত হয়। পুদোভকিনের ছবিটির মানবিকতা ও গীতিময়তা লক্ষণীয়। আঙ্গিকের দখলও অবশ্যই আছে, তবে আইজেনস্টাইনের অকাট্য গাণিতিক অবশ্যম্ভাবিতা নেই। সংগীতের উপমা দিলে বলতে হয় আইজেনস্টাইন যেন বাখের কথা স্মরণ করায়, আর পুদোভকিন যেন বেটোফেনের সমগোত্রীয়।

সোভিয়েত নির্বাক চলচ্চিত্রের তৃতীয় প্রতিভা আলেকজান্দার দোভচেঙ্কোর আবির্ভাব হয় ১৯২৬ সালে। দোভচেঙ্কো ছবি আঁকতেন। গণতান্ত্রিক সমাজে চিত্রশিল্পের চেয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ বেশি উজ্জ্বল এই ধারণা অকস্মাৎ তাঁর মনে উদিত হওয়ায় তিনি খারকভের বাড়ি ছেড়ে ওদেসার ফিল্ম স্টুডিওতে উপস্থিত হন। অল্প কদিনের মধ্যেই দুখানা কমেডি ছবি করে হাত পাকিয়ে তিনি উপকথামূলক তৃতীয় ছবি Zvenigora রচনা করেন। ছবিটি শেষ হবার পর ওদেসার স্টুডিওর মালিক তাঁর মস্কোর প্রতিনিধিকে সেটি পাঠান। উক্ত প্রতিনিধি ছবি দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আইজেনস্টাইন ও পুদোভকিনের মতামতের জন্য তাঁদের ডেকে এনে সেটি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। আইজেনস্টাইন বলেছেন, 'Pudovkin and I had a wonderful task ; to answer the questioning eyes of the auditorium with a joyful welcome of our new colleague and to be the first to greet him !'

এর পরের চার বছরের মধ্যে একের পর এক বহু ছবি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের খ্যাতি সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করতে সাহায্য করে। আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন' ও 'অক্টোবর' পুদোভকিনের 'এণ্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ, ও 'স্টর্ম ওভার এশিয়া', দোভচেঙ্কোর 'আর্সেনাল' ও 'আর্থ', তুরিনের ডকুমেন্টারি 'টুর্কসিব', রুম-এর 'বেড অ্যাণ্ড সোফা', এর্মলেরের 'ফ্র্যাগমেন্টস অফ অ্যান এম্পায়ার', মিখাইল রম্-এর 'দ্য গোস্ট দ্যাট উইল নট রিটার্ণ' ইত্যাদি সবই এই চার বছরের মধ্যে তৈরি।

'জেনারেল লাইন' ছবির সম্পাদনার সময়ই আইজেনস্টাইন স্টেট ইনসটিটিউটে শিক্ষকতা করবার কথা চিন্তা করেছিলেন। চলচ্চিত্র তত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তার ফলে তিনি যে সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেগুলি তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

স্টেট ইনস্টিটিউটে বছর খানেক অধ্যাপনার পর আইজেনস্টাইন ক্যামেরাম্যান তিসে ও সহকারী আলেকজান্দ্রফকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯২৯ সালে আমেরিকায় সবাক চিত্রের প্রবর্তন হয়। এই নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ছিল এই সফরের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া আইজেনস্টাইন কিছুদিন যাবৎ মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল'-এর একটা চিত্ররূপ পরিকল্পনা করছিলেন, এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধনতান্ত্রিক আমেরিকার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না হলে একাজ সম্ভব নয়।

আমেরিকায় পৌঁছানোর পর হলিউডের দু'একটি কোম্পানি আইজেনস্টাইনকে ছবি করবার প্রস্তাব দেন। এগুলি শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। অবশেষে আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় মেক্সিকান সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রামাণ্য ছবি Que Viva Mexico তোলার উদ্দেশ্যে মেক্সিকোয় গিয়ে দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে, লক্ষ লক্ষ ফুট ফিল্ম ব্যয় করে, তার সমস্তই সিনক্লেয়ারের জিম্মায় রেখে দেশে ফিরে আসেন। সিনক্লেয়ার কথা দিয়েছিলেন, ল্যাবরেটারির কাজ শেষ হলে সমস্ত মাল সম্পাদনার জন্য রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সিনক্লেয়ার একটি চিঠিতে জানান যে মেক্সিকোর খরচ উশুল করার জন্য তিনি সমস্ত মাল একটি হলিউড কোম্পানিকে বেচে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় সবাক ছবি তোলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এবং প্রথম সবাক ছবি নিকোলাই এক্-এর কাব্যময় 'রোড টু লাইফ' দেখানো হয়ে গিয়েছে। শব্দ ও ইমেজের কী সম্পর্ক হওয়া উচিত তাই নিয়ে তর্ক-বিতর্কও সিনেমা পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। একে একে পুদোভকিন (ডেজার্টার), দোভচেঙ্কো (ইভান), ইউৎকেভিচ (গোল্ডেন মাউনটেন্স), কুলেশভ (মেন অ্যান্ড জবস্)—সকলেই সবাক ছবি তুললেন। অন্যান্য দেশের চেয়ে কিছু দেরিতে আরম্ভ করার ফলে প্রথম দিকের সোভিয়েত সবাক চিত্রে ইউরোপ বা আমেরিকার প্রথম সবাক ছবির দোষগুলি (কথার অতিরিক্ত প্রাধান্য বা সরাসরি মঞ্চাভিনয়ের চিত্ররূপ) ছিল না।

নির্বাক যুগে চারখানা অসাধারণ ছবি তৈরি করা সত্ত্বেও আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আইজেনস্টাইন সরকারের কাছ থেকে তেমন সমাদর পেলেন না। চারিদিকেই তখন শিল্পীদের উপর সরকারী নজরের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইজেনস্টাইন তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য যে কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন, কর্তা শুমিয়াৎস্কি তা নাকচ করে দিয়ে অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে ছবি করার আদেশ দিলেন। সেটিও শেষকালে বানচাল হয়ে যাওয়ায় আইজেনস্টাইন চিত্র রচনার কাজ বন্ধ করে দিয়ে অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। একাজে অবশ্যি তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। অল্প কালের মধ্যেই নানা শিক্ষারীতির প্রবর্তন করে তিনি বিদ্যালয়ের ভোল একেবারে পাল্টে দিলেন।

৪

সবাক যুগের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত চলচ্চিত্রের এই পঁয়ত্রিশ বছরের অনেকটা সময় অনেক প্রথম শ্রেণীর সোভিয়েত পরিচালক সরকারী হস্তক্ষেপের

ফলে হয় ইচ্ছামত ছবি করতে পারেননি, না হয় ছবি করে তা সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক সময় সরকার তৈরি ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তার প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছেন, আবার এক এক সময় ছবি প্রদর্শিত হয়ে সরকারী সমালোচনার কষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। এমন না হলে যে দেশে গড়পড়তা বছরে একশটি করে ছবি তৈরি হয়েছে, যে দেশের নির্বাক ছবি সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করেছে, সে দেশে সবাক যুগে ত্রিশ বছরে প্রায় তিন হাজার ছবির মধ্যে মাত্র ত্রিশখানা ছবির নাম কেন লোকে মনে রাখবে ?

এর একটা কারণ অবশ্য এই যে চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটার মধ্যেই কতকগুলো পরস্পর-বিরোধী দিক আছে যেগুলো সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেমন, দর্শক-নিরপেক্ষভাবে চলচ্চিত্র রচনা সম্ভব নয়—সে যেমন আমেরিকাতেও নয়, তেমনই সোভিয়েত রাশিয়াতেও নয়। অথচ দর্শকমন বলে যে বস্তুটির উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, বা থাকা সম্ভব নয়। তাহলে সেই দর্শকমনের সঙ্গে শিল্পীমনের সমন্বয় ঘটবে কী করে ? দ্বিতীয়, ধনতান্ত্রিক সমাজে চিত্রনির্মাতার স্বাধীনতা যেমন মালিকপক্ষের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল, সেরকম গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার যেখানে শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেবেন, সেখানেও শিল্পীর স্বাধীনতা এই নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ। আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, দোভচেঙ্কো, দনস্কই প্রমুখ প্রত্যেককেই কোন না কোন সময় তাঁদের রচিত চিত্রনাট্য বা চলচ্চিত্রের জন্য সরকারী কটাক্ষ ভোগ করতে হয়েছে। অথচ এঁরা যে প্রতিভাবান সমাজসচেতন শিল্পী নন একথা বলার স্পর্ধা আমাদের আছে কি ?

ত্রিশ শতকের কিছু সবাক সোভিয়েত ছবি স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে আজও দেদীপ্যমান। আইজেনস্টাইনের 'আলেকজান্দার নেভস্কি', ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয়ের 'চাপাইয়েফ'। ভের্তফের 'থ্রি সংস অফ লেনিন', দনস্কইয়ের গোর্কি জীবনী, দোভচেঙ্কোর আর্থ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে প্রথম মহাযুদ্ধের মতোই একটা ব্যাপক দেশাত্মবোধের উন্মেষ সরকার ও শিল্পীর মনোভাবের একটা সমন্বয় ঘটিয়েছিল। ফলে কিছু স্মরণযোগ্য ফ্যাসিস্টবিরোধী ছবি ও কিছু চমৎকার ডকুমেন্টারির উৎপত্তি হয়। যুদ্ধকালীন আরো কয়েকটি ভালো ছবির মধ্যে পুদোভকিনের 'জেনারেল সুভোরোফ' ও দোভচেঙ্কো-কৃত উদ্ভিদবিজ্ঞানী মিচুরিনের জীবনীচিত্রের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু চিত্রনির্মাতার স্বাধীনতার অভাবে কোনোটাই মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।

আইজেনস্টাইনের শেষ ছবি 'ইভান দি টেরিবল'-ও রচিত হয় এই যুদ্ধের মধ্যেই। তিন খণ্ডে পরিকল্পিত এই বিশাল ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম খণ্ডটি ১৯৪৪ সালে প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশ স্তালিনের আমলে নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, সরকারী মতে পরিচালক নাকি ইভান চরিত্রে অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা আরোপ করে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে স্তালিনোত্তর যুগে ইভানের দ্বিতীয় পর্ব দেখে আমরা উপলব্ধি করি যে

চলচ্চিত্রে কোনো শিল্পকীর্তি যদি শেক্সপিয়রের পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে তবে তা আইজেনস্টাইন রচিত দুই খণ্ডে অসমাপ্ত ইভানের জীবনীচিত্র। এ ছবি আদৌ চলচ্চিত্র কিনা, নাকি একে অপেরার ছাঁচে ঢেলে পরিচালক চলচ্চিত্র শিল্পের অবমাননা করেছেন, বা ইতিহাসকে বিকৃত করার অধিকার চলচ্চিত্র রচয়িতার আছে কিনা ইত্যাদি অনেক অর্বাচীন তর্ক ইভানকে কেন্দ্র করে হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে। সুখের বিষয় মহৎ শিল্পকীর্তির স্থান চিরকালই সমালোচনার অনেক ঊর্ধ্বে।

স্তালিনোত্তর যুগে সোভিয়েত সরকারের চলচ্চিত্র নীতি অনেকটা মোলায়েম হলেও, সাম্প্রতিক সোভিয়েত চলচ্চিত্র কিছুটা নিষ্প্রভ বলে মনে হয়. বিশেষত আধুনিক জীবনযাত্রামূলক ছবিতে চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রায়ই একটা অতিরিক্ত সরলীকরণ লক্ষ করা যায়। তবে মাঝে মাঝে এখনও প্রথম শ্রেণীর কাজ দেখা যায় ঐতিহাসিক বা জীবনীমূলক ছবিতে। আর দেখা যায় শেকসপিয়র, চেখভ, তলস্তয় গোত্রীয় সংসাহিত্যিকের নাটক বা উপন্যাসের ভিত্তিতে রচিত 'পিরিয়ড' ছবিতে। এই সব দিক দিয়ে সোভিয়েত ছবি নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কারণ অভিনয়রীতির বৈচিত্র্যে, আলোকচিত্র গ্রহণের লালিত্যে, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের বাস্তবানুগত্যে, রং ও সংগীতের পরিমিত ও রুচিপূর্ণ ব্যবহারে সোভিয়েত ছবির সত্যিই তুলনা নেই এবং একথা আগের মতোই এখনো প্রযোজ্য।

তাই যেমন ভোলা যায় না 'আর্থ' ছবিতে চাঁদনিরাতে খোলা মাঠে ভাসিলির নাচের দৃশ্য, বা পোটেমকিনে ওডেসার সিঁড়িতে হত্যাকাণ্ডের শব্দহীন বিভীষিকা, তেমনই ভোলা যায় না চেরকাসভের ইভান, স্মোকতুনভস্কির হ্যামলেট, বোন্দারচুকের ওথেলো; ভোলা যায় না নেভস্কি ও ইভানে প্রোকোফিয়েফের সংগীত, ভোলা যায় না মিচুরিনে দোভচেঙ্কোর রং-এর ব্যবহার, হ্যামলেটে এলসিনোরের কেল্লা, ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে নাতাশার নাচের দৃশ্য।

'সোভিয়েত বিপ্লব পরিচয়' শারদীয় ১৯৬৭

অতীতের বাংলা ছবি

জনি ওয়াইসমূলারের প্রথম ছবি টার্জান দি এপ ম্যান দেখতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে আমার প্রথম বাঙলা ছবি দেখা হয়ে যায়। টার্জান হচ্ছিল গ্লোবে—সবাক যুগের প্রথম টার্জান ছবির প্রথম শো—আর তার কাছেই অলবিয়ন সিনেমায় (এখনকার রিগ্যাল) হচ্ছিল 'কাল পরিণয়'। আমার এক মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম ছবি দেখতে। বছরে খান দুয়েকের বেশি ছবি দেখার সুযোগ আসে না, কাজেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হবে ভাবতেই মনটা ভারী হয়ে গেল। আমার বিমর্ষ ভাব দেখেই বোধহয় মামা নিয়ে গেলেন অলবিয়নে। হলিউডের ছবিতে ১৯২৭-এ সাউণ্ড এসে গেলেও বাঙলা ছবি ছিল তখনও নির্বাক। এখনও মনে আছে বিয়ের রাতের অভিনব প্রেমের দৃশ্যে স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের পা ঘষাঘষির ক্লোজ-আপ। আর সেই সঙ্গে মামার উসখুসুনি—নিঃসন্দেহে ভাবছেন কী কুক্ষণেই এমন ছবি দেখতে আনলাম এই বালককে।

বাঙলা ছবির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় স্বভাবতই প্রীতিকর হয়নি। হয়ত সেই কারণেই বাঙলা ছবি দেখার খুব একটা আগ্রহ তখন বোধ করেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া ছোটদের উপযোগী বাঙলা ছবি তখন হত কি? বোধ হয় না।

সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের হাতি-মার্কা ছবির যখন বেশ নাম-ডাক, আমার দুই কাকা নীতিন ও মুকুল বোস যখন পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও শব্দযন্ত্রী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন থেকে মাঝে মাঝে আমার বাংলা ছবি দেখা শুরু। হলিউডের তখন স্বর্ণযুগ চলেছে। কলকাতায় ১৯৩৫-এ মেট্রো আর তার এক বছর পরে লাইটহাউস চিত্রগৃহ দ্বারোদঘাটন করে চিত্রমোদীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে। দুটি হাউসেই হলিউডের সব টাটকা নতুন ছবি দেখানো হচ্ছে। সেই সব ছবির তারকাদের জৌলুস, হলিউডের বিজ্ঞাপনের চটক, হলিউডের জাঁকজমক ছলচাতুরী কলাকৌশল— এসবের কাছে বাংলা ছবি দাঁড়াবে কী করে? স্বভাবতই হলিউডের তুলনায় আমাদের ছবিকে নিষ্প্রভ বলে মনে হত, মনে হত আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। এমনও মনে হত যে শিল্প সাহিত্য সংগীতে অগ্রসর বাঙালী হয়ত পশ্চিমের অবদান এই যান্ত্রিক শিল্পটিকে রপ্ত করতে পারছে না, এবং ভবিষ্যতেও পারবে না, কারণ এ জিনিসটা তাদের রক্তে নেই। সত্যি বলতে

কি, বাঙলা ছবি তখন দেখতে হত অন্য মন নিয়ে। আর তার বিচারে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হত সেটাও ছিল বিদেশী ছবি থেকে ভিন্ন।

তখনকার দিনে (আমি বিশেষ করে সবাক যুগের প্রথম দুই দশকের কথা বলছি) যেমন হলিউডে তেমনি বাঙলাতে প্রায় সব পরিচালকই মেনে নিতেন যে ছবি হল সকলের দেখার জন্য, সব স্তরের দর্শকের মন খুশি করার জন্য। চলচ্চিত্র যে একটা সিরিয়াস আর্ট হতে পারে, গভীর তথ্য, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, দোষেগুণে মেশানো জটিল চরিত্র—বাঙলার সার্থক উপন্যাসে যার সাক্ষাৎ মেলে—এসব যে চলচ্চিত্রে স্থান পেতে পারে এটা কেউ মানতেন না। হলিউডের মতো বাঙলাতেও তখন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক কাহিনীকার—চিত্রনাট্যকার হিসাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যুগে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে। আরো পরে যোগ দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিশ দশকেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে বাঙলায় প্রথম প্রামাণ্য বই লিখেছিলেন সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব। কিন্তু এই সব সাহিত্যিকের সান্নিধ্যও বাঙলা ছবিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে পারেনি। তার সহজ কারণ এই যে এঁরাও চলচ্চিত্রকে জাত শিল্প হিসাবে মনে করতেন না। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিনেমার জন্য লেখা উপন্যাস 'দম্পতি' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আমার কথা সত্য বলে মানবেন। বাঙলা ছবির উপাদান কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখনকার সাহিত্যিকদের ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার এক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের কাছে আমি তাঁর একটি গল্প ছবি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমার এ গল্প ত সাহিত্যের গল্প মশাই ; গল্প থেকে ছবি হবে কী করে ?' আসলে চলচ্চিত্রকে তখন পপুলার আর্ট হিসাবেই দেখা হত। এবং পপুলার আর্ট সৃষ্টি করার জন্য যেসব মালমশলা দরকার সেগুলো ছবিতে প্রয়োগ করার দিকে দৃষ্টি রাখতেন পরিচালক।

এটাও মনে রাখা দরকার যে সেকালে বাঙলাদেশে ছবি ও প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিল অনেক কম। আর দর্শকের চাহিদাটাও ছিল একটু অন্য ধরনের। হিন্দি ছবির নাচ-গান-অ্যাকশন-মেলোড্রামার ফর্মুলা তখনও উদ্ভব হয়নি। সামাজিক ছবি, পৌরাণিক ছবি ও ধর্মমূলক ছবি—এই তিন শ্রেণীতেই ভাগ করা যেত তখনকার বাঙলা ছবিকে। অবিশ্যি আজও যে এই নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে তা বলা যায় না, আর গত কয়েক বছরে যা দেখা গেছে তাতে মনে হয় সাধারণ দর্শকের চাহিদারও খুব বেশি রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু সম্প্রতি বাজারে ও টেলিভিশনে ত্রিশ দশকের কিছু বাঙলা ছবি নতুন করে দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে উপরোক্ত তিন শ্রেণীভুক্ত আজকের বাঙলা ছবি আগের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। সবাক যুগের গোড়ার দিকেই বাঙলার, বিশেষত নিউ থিয়েটার্সের— কলাকুশলীরা ছবির যান্ত্রিক দিকটা যে পরিমাণ আয়ত্ত করেছিলেন, ক্যামেরা সাউণ্ড ও সম্পাদনার কাজে যে অনুশীলনের পরিচয় দিতেন, ল্যাবরেটারির কাজে যে পারিপাট্য লক্ষ করা যেত, সেরকম আজকের প্রায় কোনো ছবিতেই দেখা যায় না। এইসব গুণের বিচারে

তখনকার বাঙলা ছবিকে বেশ অগ্রসর বলেই মনে হত।

এখানে মনে রাখতে হবে যে সে যুগটা রিয়ালিজম-এর যুগ ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশ রচনায় হলিউড তখন সিদ্ধহস্ত। বেশির ভাগ কাজই হত স্টুডিওতে। আর্ক লাইট তখন সূর্যের আলোর স্থান নিত। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বনবনানী সবই তৈরি হত স্টুডিওর চত্বরে। এতে কাজের সুবিধে ছিল, আর দর্শকও ছিল এই কনভেনশনে অভ্যস্ত। মঞ্চের দর্শক যেমন ছাদবিহীন তিন দেয়াল বিশিষ্ট বাসস্থানকে মেনে নেয়, তেমনি সিনেমার দর্শক মেনে নিত এই কৃত্রিম পরিবেশকে। অবিশ্যি হলিউডে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম দেখা যেত—যেমন 'ওয়েস্টার্ন' পর্যায়ভুক্ত ছবিতে। ওয়েস্টার্নের উন্মুক্ত প্রান্তর—যেখানে ঘোড়া ছুটতে পারে অবাধে—এ জিনিস স্টুডিওতে তৈরি করা হলিউডেরও অসাধ্য ছিল। এই কৃত্রিম পরিবেশ সত্ত্বেও চিত্রনাট্য, অভিনয় ও পরিচালনার গুণে হলিউডের সেরা ছবিগুলি রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠত।

দুঃখের বিষয় এই তিনটি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় বাঙলা ছবি সেকালে হলিউডের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি অথচ অনেক ব্যাপারে সরাসরি হলিউডের অনুকরণ করা হত বাঙলা ছবিতে। পশ্চাৎপট যেখানে আধুনিক ও বিষয়বস্তু সামাজিক, সেখানেই এই অনুকরণ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত। পরনে স্যুট হ্যাট বা ড্রেসিংগাউন, হালফ্যাসানের আসবাবে ভরা ঘরের ভিতর দিয়ে উঠে যাওয়া ঘোরানো সিঁড়ি, দেওয়ালের রঙ সাদা না হয়ে ধূসর (অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ফুলকারি করা ওয়ল পেপার) উচ্চ মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় গ্র্যাণ্ডপিয়ানো, এবং সেই পিয়ানো বাজিয়ে নায়ক নায়িকার গান—এ সবই হলিউডের অনুকরণ। দিদি, জীবনমরণ, প্রতিশ্রুতি, মুক্তি, রজতজয়ন্তী, ডাক্তার, নার্স সিসি ইত্যাদি তখনকার দিনের বহু প্রশংসিত জনপ্রিয় ছবির সব কটিতেই এই অনুকরণ লক্ষণীয়। আসলে বাঙালী জীবনের স্বাভাবিক চেহারাটায় একটা বিলিতি পালিশ না দিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরার সাহস তখন খুব কম পরিচালকেরই ছিল, অথচ ইঙ্গবঙ্গ জীবনের বাস্তব চেহারাটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কোনো পরিচালক করেছেন বলে মনে পড়ে না।

এখানে একটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা দরকার। সবাক যুগের গোড়ার দিকে তোলা চারু রায়ের 'বাঙালী' ছবিটি আমি প্রথম দেখি বছর দশেক আগে। এ ছবিতে মধ্যবিত্ত জীবনের যে ডিটেল-সম্বলিত চেহারাটা পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছিলেন তেমন আর তখনকার কোনো ছবিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দুঃখের বিষয়, চারু রায়ের অন্য কোনো ছবি দেখার সুযোগ আমার হয়নি যদিও সে-সব ছবির কিছু স্থিরচিত্র দেখে আমার মনে হয়েছে যে চারু রায় হলিউডের প্রভাব এড়াতে পেরেছিলেন।

হলিউডের ছাপ অপেক্ষাকৃত কম দেখা যেত দুই শ্রেণীর ছবিতে। এক হল ধর্মমূলক ছবি—যেমন দেবকী বসুর বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, আরেক হল খাঁটি বাঙালা উপন্যাসের ভিত্তিতে তোলা কিছু ছবি—যেমন কাশীনাথ, পল্লীসমাজ, গোরা, চোখের বালি—যেখানে উপন্যাসের প্রতি আনুগত্যই হলিউডকে বেশি কাছে আসতে দেয়নি। কিন্তু এইসব ছবির বাঙালীত্ব কেবলমাত্র বিষয়বস্তুতেই

নিবদ্ধ। এর চিত্রভাষায় এমন কোনো সজীব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই যাতে মনে হতে পারে এই ভাষার শিকড় রয়েছে বাঙলার মাটিতে। আসলে এর উৎস হল বাঙলার থিয়েটার।

এই থিয়েটারের পথ ধরেই বাঙলা ছবিতে গানের প্রবেশ। বাঙলা ছবির পরিণতির পথে যে যত্রতত্র গানের ব্যবহার একটা প্রধান প্রতিবন্ধকের কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতিতে গানের ব্যবহার হয়ত ততটা অসংগত নয়, কিন্তু যে কোনো পরিচালকের যে কোনো ছবিতেই যদি গান এসে পড়ে, তাহলে সেটাকে একটা জাতীয় বাতিকের পর্যায়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই বাতিকেই কুন্দনলাল সায়গলকে তার আড়ষ্ট বাঙলা সত্ত্বেও নায়কের আসনে বসিয়েছিল এবং নিউ থিয়েটার্সের একাধিক ছবির আর্থিক সাফল্যের পথ সহজ করে দিয়েছিল। আসলে বাঙালী দর্শক ছবিতে গান ভালবাসে এবং মনের মতো গান পেলে পরিচালকের সাত খুন মাপ করে।

ত্রিশ দশকের বেশীর ভাগ ছবিই বাস্তবতার অভাব, চিত্রনাট্যের শৈথিল্য এবং সংলাপের আড়ষ্টতা হেতু আজকের দিনে আর মনে দাগ কাটে না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপরোক্ত কারণেই হয়ত এসব ছবির অভিনয়ও হয় আড়ষ্ট না হয় মঞ্চঘেঁষা বলে মনে হয়। তখনকার দিনে প্রমথেশ বড়ুয়ার খ্যাতি ছিল সংযমী অভিনেতা হিসাবে। তাঁর অভিনয় মঞ্চের প্রভাবমুক্ত ছিল একথা আজকের দিনেও বলা হয়। মঞ্চাভিনয়ের অভ্যাস না থাকলে এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষার উপর ষোল আনা দখল না থাকলে, অভিনয়ে মঞ্চের ছাপ না থাকাটাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রমথেশ বড়ুয়া হয়ত চেষ্টা করেও মঞ্চসুলভ অতি-অভিনয় করতে পারতেন না। আবার এমনও হতে পারে যে বিদেশের তালিম তাঁকে বাঙলা ছবির অভিনয়ের মুদ্রাদোষগুলি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করেছিল। স্টুডিওতে আলো ও ক্যামেরার ব্যবহারে বিদেশের শিক্ষার ফলে প্রমথেশ বড়ুয়া বাঙলা ছবিতে কোনো চমকপ্রদ বিশেষত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন কিনা, অথবা পেরে থাকলেও তার ফলে বাঙলা ছবির মান উন্নত হয়েছিল কিনা, সেটা আজকের দিনে বলা শক্ত। এটুকু বলতে পারি যে মুক্তি, শেষ উত্তর, শাপমুক্তি ইত্যাদি ছবিতে যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকটা আজ আর চোখে পড়ে না, যেটা পড়ে সেটা হল ছবিগুলির সামগ্রিক দো-আঁশলা ভাবটা।

চল্লিশ দশকেই প্রথম বাঙলা ছবিতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ের সবচেয়ে সাড়া জাগানো ছবি উদয়ের পথে-ই যে দর্শকের মনে এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাদ এনে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ছবির বিষয়বস্তুতে যে সমাজচেতনার পরিচয় আছে তার জন্য দায়ী অবিশ্যি কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়। কিন্তু এ ছাড়াও ছবিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য প্রশংসা পরিচালক বিমল রায়েরই প্রাপ্য। বিমল রায়ই প্রথম তারকাপ্রথা অগ্রাহ্য করে আনকোরা নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ছবির পরিবেশও ছিল তখনকার অন্যান্য ছবির তুলনায় অনেক বেশী বাস্তবানুগ। চিত্রনাট্য ছিল সুসংবদ্ধ এবং অভিনয় ও কাহিনী বিন্যাসের ঢং ছিল

চলচ্চিত্রের উপযোগী। কিন্তু সম্প্রতি নতুন করে দেখে মনে হয়েছে, উদয়ের পথে-ও ধোপে টেকেনি। তার জন্য দায়ী চরিত্র ও বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত সরলীকরণ এবং এক ধরনের সংলাপ যার সম্বন্ধে শাণিত বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু যার সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষের সাধারণ সংলাপের কোনো সাদৃশ্য নেই।

বিমল রায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি দো বিঘা জমিন রচনা করেন হিন্দিতে, বোম্বাই যাবার পরে। বোম্বাই গিয়ে ভালো ছবি—এবং বাঙলা ছবি করার দাবী যিনি করতে পারেন তিনি হলেন নীতীন বোস। রজনী বা নৌকাডুবি ছবিতে নিউ থিয়েটার্সে তোলা ছবির চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন নীতীন বোস। উদয়ের পথের কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায় বেশ কিছুকাল চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রথমে চিত্রনাট্যকার এবং পরে সেই সঙ্গে পরিচালক হিসাবে। বাঙালী নাগরিক জীবনের যে সংবেদনশীল চেহারাটা উদয়ের পথেতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা জ্যোতির্ময় রায় রচিত অভিযাত্রী, দিনের পর দিন ও শঙ্খবাণী ছবিতেও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এসব ছবিগুলি নতুন করে যাচাই করার সুযোগ আসেনি।

কলকাতায় থেকে এই সময়ই যাঁরা উল্লেখযোগ্য বাঙলা ছবি করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম করা চলে—হেমেন গুপ্ত, সত্যেন বসু ও নির্মল দে। সত্যেন বসু-র বরযাত্রী ছবি সম্প্রতি আবার দেখে টেকনিকের দিক দিয়ে অপরিণত মনে হলেও, এর ষোল আনা বাঙালী মেজাজ এবং আশ্চর্য স্বাভাবিক ও রসাল সংলাপ (এখানে বসু মহাশয় কাহিনীকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মূল সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন), এর সাবলীল অভিনয় (এ ছবিতে স্টার ছিল না) ও অজস্র হাস্যোদ্দীপক ঘটনাবলীর আবেদন আজও ম্লান হয়নি।

হেমেন গুপ্ত-র ভুলি নাই ও '৪২-এর সবচেয়ে বড় গুণ হল পরিচালকের আন্তরিকতা। তাছাড়া বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও ছবি দুটি তখনকার দিনে মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে। দেশাত্মবোধের যে সুরটি এ দুটি ছবিতে ধরা পড়েছে সেটা যে পরিচালকেরই নিজস্ব সুর, ধার করা নয়, সেটা আর বলে দিতে হয় না, এবং এই সুরই শেষ পর্যন্ত ছবির নানা যান্ত্রিক ত্রুটি সত্ত্বেও দর্শকের মনকে স্পর্শ করে।

আমার মতে নির্মল দে-র তিনটি ছবি—বসু পরিবার, সাড়ে চুয়াত্তর ও চাঁপাডাঙার বৌ—সবাক যুগের প্রথম দুই দশকের ছবির মধ্যে চিত্রোপযোগী গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। অবিশ্যি এখানেও উচ্চশ্রেণীর আর্ট বা গভীর তথ্যের প্রশ্ন আসে না। তখনকার হলিউডের বেশির ভাগ পরিচালকের মতোই নির্মল দে-রও প্রধান লক্ষ্য ছিল নানান শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন। কিন্তু এ কাজটা তিনি যেমন সুষ্ঠু ও রুচিসম্পন্নভাবে করেছিলেন তেমন আর বিশেষ কেউ করেনি। আজকের দিনে বাঙলা ছবিকে যদি হিন্দির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে এই জাতের অনেক ছবি হওয়া দরকার। শুধু আর্ট করে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না, আর বোম্বাই-এর অনুকরণ করতে গেলে বাঙলা ছবি হবে না-এদিক না-ওদিক। অবিশ্যি নির্মল দে-র মতো কাজ জানা লোক আজ আর ক'জন আছে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। চিত্রোপযোগী কাহিনী বা ভাল চিত্রনাট্যকারের অভাব এদেশে চিরকালই। তার উপর এখন যেটার প্রধান অভাব দেখা যাচ্ছে সেটা হল চলচ্চিত্রের সব-দিক-জানা

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পরিচালকের। এ অভাব কী করে মিটবে জানি না, অথচ না মিটলে সমূহ সংকট। কেবলমাত্র সরকারের অর্থানুকূল্যে এ সংকট দূর হবার কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

[illegible], শারদীয় ১৩৭৮
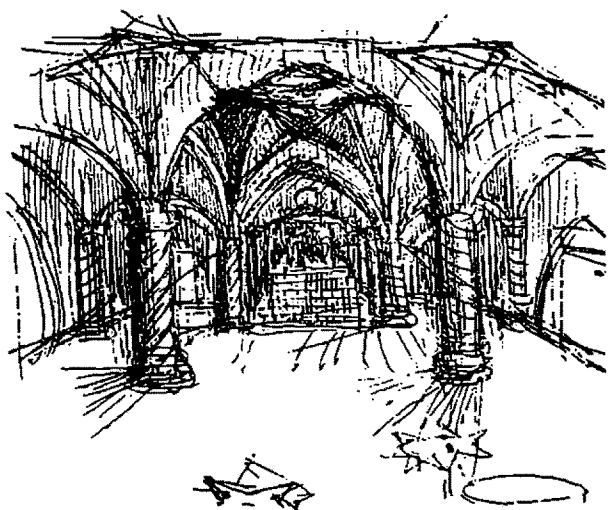
বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক

চলচ্চিত্রের আর্টের দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ব্যবসার দিকটাও স্বভাবতঃই এসে পড়ে! গোড়াতেই টাকা-আনা-পাই-এর প্রসঙ্গ তুলতে আমি লজ্জাবোধ করছি। কিন্তু কথাটা সত্যি যে ঐ তিনটি বস্তুর অভাবে চলচ্চিত্রের এগোবার পথ নেই। যন্ত্রযুগের অবদান এই যান্ত্রিক শিল্পটি সিনেমা ব্যবসার আওতায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রচুর অর্থ-ব্যয় না করে ছবি করা একেবারে অসম্ভব। ছবি করতে গেলে তার প্রাথমিক উপকরণ অর্থাৎ ক্যামেরা এবং ফিল্ম—এরই মূল্য অনেক। তার উপর অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, কলা-কুশলীদের পারিশ্রমিক আছে, স্টুডিও ভাড়া আছে, পোষাক-আষাক, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আছে। ছবি শেষ হলেও রেহাই নেই। কারণ বিজ্ঞাপনের খরচ আছে। সব মিলিয়ে একটা সহজ অনাড়ম্বর ছবির খরচের অঙ্কও লাখের কোঠা পেরিয়ে যায়, তেমন জাঁকালো ছবি হলে তো কথাই নেই। এই ব্যয়সাপেক্ষতা সিনেমা ব্যবসাকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করেছে।

শিল্পী জানেন তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে তাঁর অর্থের প্রয়োজন। আর ব্যবসায়ী জানেন যে চিত্র নির্মাণ তাঁর নিজের কর্ম নয়—সে কাজ শিল্পীর। দুজনের এই পারস্পরিক নির্ভর দুজনই স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রযোজক অর্থের সংস্থান করেন, শিল্পী অর্থাৎ পরিচালক সেই অর্থের সাহায্যে ছবি তৈরী করে প্রযোজকের হাতে তুলে দেন। প্রযোজক সেই তৈরী ছবি প্রেক্ষাগৃহ মারফৎ জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। জনসাধারণ যদি সে-ছবি সাদরে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যায় টিকিট কিনে সে-ছবি দেখেন, তবেই তার আর্থিক সাফল্য। যদি ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পগত সাফল্যের সমন্বয় ঘটে, তবে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু এক হলে আর এক হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক ভাল ছবি জনপ্রিয় ছবি নয়; আর জনপ্রিয়তা শিল্পে উৎকর্ষের সংজ্ঞাও নয়। যদি তাই হতো, তবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাহিত্য হিসাবে বাতিল করে দিতে হতো। যে-দেশে শিক্ষার প্রসার এতই সীমাবদ্ধ, সে-দেশে শিল্পের সমঝদার যে সংখ্যায় কম হবে—তাতে আর আশ্চর্যের কি? অতএব ভাল ছবি যদি পয়সা না [illegible] শিল্পী হিসেবে পরিচালকের ব্যর্থতা বোধ করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু এতে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রযোজকের আশঙ্কার কারণ ঘটতে পারে। প্রযোজকের দৃষ্টিতে ছবির সার্থকতা তাঁর আর্থিক সাফল্যে। ছবি শিল্পসম্মত হলো-কি-না-হলো- তাতে তাঁর একটা বড় এসে যায় না। ছবিতে পয়সা হলো-কি-না-হলো সেটাই তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই ব্যবসায়ীর উপরেই যখন পরিচালকের নির্ভর, তখন তাঁর দিকটা সে অগ্রাহ্য করবে কোন্ সাহসে ? কেবলমাত্র আপন খেয়াল-খুশিকে চরিতার্থ করবার জন্য শিল্প সৃষ্টি—এ সুযোগ কবির আছে সঙ্গীতকার বা যন্ত্রশিল্পীর আছে ; কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালকের নেই। তাঁকে যেমন দেখতে হবে শিল্পের দিক, তেমনি দেখতে হবে ব্যবসার প্রয়োজনটা, জনসাধারণের চাহিদাটা। এই চাহিদটা মেটাতে গিয়ে যদি আর্টকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে অবশ্য আক্ষেপের কারণ ঘটে ; কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে শিল্পের সঙ্গে জনপ্রিয়তার একটা চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ চার্লি চ্যাপলিনের ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এই সমন্বয় সহজ নয় এবং এর কোন ফর্মূলাও নেই। কিন্তু অতীতে দৃষ্টান্ত আছে বলেই ভবিষ্যতে সম্ভাবনাও আছে।

যাঁরা এই ব্যবসার গন্ডীর মধ্যে শিল্পসম্মত ছবি করার প্রয়াস করেন, এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাই তাঁদের প্রেরণা যোগায়। চলচ্চিত্রের যেগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তার সবই এই গন্ডীর মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এক শ্রেণীর চলচ্চিত্র রচয়িতা আছেন, যাঁদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো জীবিকার্জন। এই উদ্দেশ্য অসাধু এমন কথা আমি কী করে বলবো ! কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের আলোচনায় এ জাতীয় পরিচালকের কোন স্থান নেই। কারণ শিল্প-রচনা এদের উদ্দেশ্যই নয়।

এবারে আসল কথায় আসা যাক।

ভাল ছবি কাকে বলে ? ভাল গল্প মানেই কি ভাল ছবি ? অনেককেই এমন কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে বাংলাদেশের ছবির ইতিহাসে ভাল ছবির এত অভাব হলো কেন ? বাল্মীকি বেদব্যাস থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সেরা সাহিত্যিকদের কত ভাল গল্পই তো ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে ! কাহিনীর দৈন্য তো সেখানে ছিল না ! তবে কিসের দৈন্য, কিসের অভাব তাঁদের শিল্প-সাফল্য থেকে বঞ্চিত করলো ? আসলে কাহিনী মাত্রেরই দুই দিক আছে—এক হলো তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। এই দুয়ে মিলে গল্প। গল্পের আর্ট এই বলার ভঙ্গীতে। ভাল গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায়, সামান্য কাহিনী বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র শিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাসকৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভাল হলেও ছবি শিল্প-সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু ভাষা আয়ত্ত হলেও তাকে রূপ দেওয়া ও ব্যক্ত করা পরিচালকের একার কর্ম নয়। ছবি যাঁরা নিয়মিতভাবে দেখেন, তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন পর্দায় কাহিনী শুরু হবার আগে কলাকুশলীদের একটা বিস্তৃত পরিচয়লিপি দেওয়া হয়। এ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে চলচ্চিত্র একটা যৌথশিল্প। অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় একটা ছবি তৈরী হয়। এই কলাকুশলীদের

কেউ শিল্পী, কেউ কারিগর, আবার কেউ বা একাধারে শিল্পী ও কারিগর। এদের দুটো সহজ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হলো—যাঁরা থাকেন ক্যামেরার সামনে অর্থাৎ যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ; আর এক হলো—যাঁরা থাকেন ক্যামেরার পেছনে, যাঁরা নেপথ্য কর্মী—চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, ক্যামেরাশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, শিল্প-নিদের্শক, সঙ্গীত পরিচালক ও সম্পাদক। এঁরা হলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মী। কাহিনী নির্বাচনের প্রথম কাজ হল চিত্রনাট্য-রচয়িতার, ইনি কাহিনীকে চলচ্চিত্রের ছাঁচে ঢেলে সাজান। এ কাজটা লেখার কাজ। কিন্তু এই লেখার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, বা না থাকলেও কিছু এসে যায় না। চিত্র-নাট্যের ভাষা হলো ছবির ভাষায় লিখিত ইঙ্গিত মাত্র। এর মূল্য কাঠামো বা 'স্কেলিটন্' হিসেবে। মঞ্চের নাটকের মত এখানেও কাহিনীকে অঙ্কে ও দৃশ্যে ভাগ করতে হয়। কিন্তু দৃশ্যের মধ্যেও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের বা শট্ পরিবর্তনের রীতি আছে। তার সঙ্গে নাটকের কোন মিল নেই। এ একেবারে সিনেমার নিজস্ব রীতি। সিনেমার ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে এই রীতি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্যের কাজটা পরিচালকের পক্ষেই করা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক সময় চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনার অক্ষমতা হেতু পরিচালককে সাহিত্যিকের শরণাপন্ন হতে হয়। ছবির যে ভাষার ইঙ্গিত চিত্রনাট্যে দেওয়া হলো, তাকে ব্যক্ত করতে হবে ক্যামেরার মাধ্যমে। ক্যামেরার তোলা ছবির পর ছবি জুড়ে চলচ্চিত্রে কাহিনীর সামগ্রিক চেহারাটা ফুটে উঠবে। কাহিনীর যা-কিছু বর্ণনা—নায়িকার রূপ, নায়কের পৌরুষ, পল্লীর শ্যামলতা, বস্তির বদ্ধতা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ—এ সবই ক্যামেরার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। মানুষের চোখ যা দেখে, ক্যামেরার চোখ তার চেয়ে বেশী বৈ কম দেখে না। প্রয়োজনে ছোটকে বড়, দূরকে নিকট, অসুন্দরকে সুন্দর—এমনকি দিনকে রাত পর্যন্ত দেখানো ক্যামেরার সামর্থ্যের ভেতর। ক্যামেরা তাই পরিচালকের হাতের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। এই যে ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গী—এরও ঠিক-বেঠিক আছে, সঙ্গতি-অসঙ্গতি আছে।

কাহিনীর ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যা সাহায্য করবে, বক্তব্যকে যা পরিস্ফুট করবে—তাই ঠিক, তাই শিল্পসম্মত। কাহিনীর প্রয়োজনের বাইরে যা-কিছু ক্যামেরার কারসাজি, ছবির সামগ্রিক বিচারে তার কোন মূল্য নেই। ক্যামেরাচালকের যদি শিল্পবোধ বা নাট্যবোধের অভাব হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে পরিচালকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। তাঁর কাজ তখন কারিগরীতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাঁর অক্ষমতার অনুপাতে ছবির ভাষাও দুর্বল হয়ে পড়ে। শব্দযন্ত্রী, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক, সঙ্গীত-পরিচালক—এঁদের সকলকে পরিচালকের প্রয়োজন বুঝে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনীর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হয়। এঁদের সাফল্যে ছবির সাফল্য। উদাহরণস্বরূপ শিল্পনির্দেশককে ধরা যাক। নায়কের বাসস্থান হিসেবে ইনি যে ঘরটি তৈরী করবেন, সেই ঘরের আকৃতি, আয়তন, তার আসবাব, তার দেওয়ালের ছবি, তার পারিপাট্য বা অপারিপাট্য, অর্থাৎ ঘরের সামগ্রিক চেহারা যদি এই বিশেষ কাহিনীর এই বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করে, তবে সেই ঘর যতই সুদৃশ্য বা সুনির্মিত হোক, শিল্প হিসেবে

তার কোন মূল্য নেই। অভিনয়ের বেলাতেও ঐ একই কথা। বাংলাদেশে অভিনয়ের একটা ঐতিহ্য আছে, সে হলো মঞ্চ-ঐতিহ্য। মঞ্চের অভিনয় চলচ্চিত্রে কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, তা শিল্প-বিরুদ্ধ। মঞ্চের পরিবেশ তো বাস্তব পরিবেশ নয়। মঞ্চের তিন দেওয়ালের ঘরকে কেউ বাস্তব ঘর বলে মেনে নেন না। মঞ্চের অভিনয়, চালচলনও তেমনি বাস্তব জীবনের চালচলনও হতে পারে না। এটা কেউ আশাও করে না। কিন্তু সিনেমার বাস্তব পরিবেশে এই অতি অভিনয় অতি পীড়াদায়ক। এর জন্য অবশ্য অভিনেতাকে দায়ী করা অন্যায়। কোন গল্পের কোন চরিত্রের অভিনয় কোন্ সুরে বাঁধতে হবে সে বোধ পরিচালকের থাকা চাই। শুধু তাই নয়, অভিনেতার মধ্যেও সেই বোধ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা থাকা চাই। তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী অভিনয় তাঁকে আদায় করে নিতে হবে। ছবির দোষ বা গুণ, শিল্প হিসেবে ব্যর্থতা এবং সাফল্য, দু-এর অধিকাংশের জন্য দায়ী পরিচালক। দর্শক ও সমালোচকদের এ কথাটা মনে রাখতে হবে যখন তাঁরা ছবির গুণাগুণ বিচার করবেন। ছবির গল্প ভাল নয় বলে কাহিনীকারকে দোষ দিলে চলবে না। সে গল্প পরিচালক নির্বাচন করলেন কেন? অভিনয়ে যদি ত্রুটি থাকে, তবে সে ত্রুটি পরিচালকের দৃষ্টি এড়ালো কেন? গাঁথুনির দুর্বলতা কি সম্পাদকের, না চিত্রনাট্যের গাঁথুনিতেই গলদ আছে? অবশ্য গলদ কোথায় সঠিক বুঝতে হলে চলচ্চিত্রের রীতি-নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলা ছবির সমালোচনা করতে গেলে কি অবস্থায় সে ছবি তৈরী হয়, তা জানতে হবে। খারাপের অনুপাতে ভাল ছবির সংখ্যা কম, এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। পৃথিবীর যে-কোন দেশে যে কোন শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে একথা খাটে; চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তো বটেই। আসলে শিল্পীর অবর্তমানে শিল্পসৃষ্টি আশা করাই ভুল।

প্রতিভা সর্বকালে সর্বদেশে বিরল। তবে বিদেশে শিল্পশিক্ষার সুযোগ আছে; চলচ্চিত্রের বিদ্যালয় আছে। অভিনয়, পরিচালনা, ক্যামেরার কাজ—এ সবই শেখার ব্যবস্থা আছে। ভাল ছবি দেখে তার ব্যাকরণ, তার ভাষা, তার রীতিনীতি বিশ্লেষণ করবার সুযোগ আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে এসব কোন সুযোগই নেই, শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। তা সত্ত্বেও বাংলা ছবির সাফল্য তার অভিনয়ের মান, তার কলাকুশলীদের কৃতিত্ব—এ নিয়ে গর্ব না করে থাকা যায় না। এ অবস্থায় আর কোন দেশে এত দূর সম্ভব হতো কিনা সে বিষয়ে আমি অন্তত সন্দেহ পোষণ করি।

—আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত

বেতার জগৎ, শারদীয়, ১৯৬০

pathagar.net

চলচ্চিত্র-রচনা : আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি

চলচ্চিত্র শিল্প কি না সে নিয়ে এখনো তর্ক ওঠে। যাঁরা একে সে মর্যাদা দিতে নারাজ তাঁরা বলেন যে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সত্তা বলে তো কিছু নেই, এ হল আর পাঁচটা শিল্প-সাহিত্য মিশ্রিত একটা পাঁচমিশালী কিম্ভূত।

আসলে গোলমালটা ওই শিল্প কথাটাকে নিয়েই। শিল্প না বলে যদি ভাষা বলা হয়, তাহলে বোধহয় চলচ্চিত্রের স্বরূপটা আরো স্পষ্ট হয়, এবং তর্কেরও আর অবকাশ থাকে না।

লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (image) ও শব্দ (sound)। এই দুইয়ে মিলে যে ভাষা, তার প্রয়োগে যদি মুনশীয়ানার অভাব হয়, তার ব্যাকরণ যদি রচয়িতার আয়ত্ত না থাকে এবং সব মিলিয়ে ছবির বক্তব্যে যদি জোর না থাকে, তাহলে ভাল ছবি হবে কী করে? এত যে লেখা হয়, তার কতটুকুই বা সাহিত্য হয়ে ওঠে। শিল্পী আগে, তার পরে তো শিল্প। যেখানে শিল্পী নেই, সেখানে শিল্পের উপকরণ থাকলেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব নয়।

চলচ্চিত্রে যে অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা, সঙ্গীতের গতি ও ছন্দ, পেইন্টিং সুলভ আলোছায়ার ব্যঞ্জনা, এ-সবই চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ইমেজ ও ধ্বনির যে ভাষা, দেখানো শোনানোর বাইরে যার প্রকাশ নেই, সে একেবারে স্বতন্ত্র ভাষা। ফলে বক্তব্য এক হলেও ভঙ্গির তফাত হতে বাধ্য। এ ভঙ্গি চলচ্চিত্রের বিশেষ ভঙ্গি। তাই অন্য শিল্প-সাহিত্যের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র অনন্য।

ইমেজ ও ধ্বনি। ইমেজ এখানে শুধু ছবিই নয়—বাঙ্ময় ছবি। অর্থাৎ ছবির ছবিত্বেই ছবির শেষ নয়, শুরুও নয়—যেমন শুরু ও শেষ পেইন্টিং'-এ। এখানে মুখ্য হল ছবির অর্থ। এক একটি ছবি এক একটি বাক্য, সব ছবি মিলিয়ে পুরো বক্তব্য। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগেও ছবি অর্থ বহন করেছে। এর ভাষা সংলাপ-নিরপেক্ষ।

আর ধ্বনি? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। চোখ-কান দুই-ই সজাগ না রাখলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায় না। যদি কোনো দৃশ্যে ধ্বনি না থাকে, তবে সে না-থাকাটাই ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। নৈঃশব্দ্যই তার বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

লেখকের বিষয়বস্তু ও ভঙ্গি অনুযায়ী যেমন লেখার শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে, চলচ্চিত্রেও তা সম্ভব। উপন্যাস, কাব্য, নাটক, জীবনী, শিক্ষামূলক বিবরণ এ-সবই চলচ্চিত্রে রচিত হয়েছে। আমরা বর্তমান আলোচনার জন্য শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর দিকেই নজর দেব—সেটি হল কাহিনীমূলক চলচ্চিত্র। এটাই সবচেয়ে বেশি পরিচিত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবির অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত।

ছবি তৈরির কাজকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম হল চিত্রনাট্য রচনা (Scenario)। দ্বিতীয়, সেই চিত্রনাট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশ বাছাই (Location) অথবা তৈরি (Sets) করে সেই পরিবেশে চরিত্রানুযায়ী লোক দিয়ে অভিনয় করিয়ে তার ছবি তোলা (Shooting)। তৃতীয়, এই খণ্ড খণ্ড ভাবে তোলা ছবিকে চিত্রনাট্য অনুসারে গুছিয়ে সাজানো (editing)। চিত্রনাট্য হল ছবির কাঠামো। ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হল তার লিখিত ইঙ্গিত। এই কাঠামোকে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের কলাকুশলিগণ পরিচালকের নির্দেশে সমবেতভাবে কাজ করে চলচ্চিত্রকে সাবয়ব, সজীব করে তোলে। চিত্রনাট্য তাই অবহেলার জিনিস নয়। এতে যদি খুঁত থাকে তাহলে ছবির অঙ্গসৌষ্ঠবে তার প্রতিফলন হতে বাধ্য, তা সে পরিচালনা যতই সুষ্ঠু হোক। আবার চিত্রনাট্য ভাল হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না, কারণ দুর্বল পরিচালনার ফলে তা নষ্ট হতে পারে।

চিত্রনাট্যের কাজ ছাড়া ছবির অন্য সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। চলচ্চিত্র একান্তই যন্ত্রযুগের ভাষা। ক্যামেরা নামক যন্ত্রের আবিষ্কার না হলে যে এ-ভাষার সৃষ্টি হত না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর ছবির ভাষার সঙ্গে ধ্বনির ভাষার যে যোগ সবাক যুগে সম্ভব হল তা শব্দযন্ত্রের (Sound recording machine) আবিষ্কার থেকেই।

শুটিং-এ ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের সাহায্যে যে ছবি ও শব্দের ফিল্ম তোলা হল, তাকে ফুটিয়ে তুলতে (developing and printing) ল্যাবরেটরির যাবতীয় যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। তারপর এই ছবি ও শব্দের টুকরোগুলি Moviola নামক যন্ত্রে বারবার চালিয়ে দেখে তার থেকে ভাল-মন্দ বাছাই করে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে (অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে) আঠা (Film cement) দিয়ে জোড়ার দায়িত্ব সম্পাদকের (editor)। সবশেষে আবহসঙ্গীত (back-ground music)। বাদ্যযন্ত্রের কাজ শব্দযন্ত্রে তুলে তাকে re-recording যন্ত্রে অন্যান্য শব্দ সংলাপ ইত্যাদির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে মিলিয়ে দেবার জটিল অধ্যায় শেষ হলে পরে যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি।

বলা বাহুল্য এসব যন্ত্রের পিছনে যে কর্মীরা থাকেন, তাঁরাও যদি যন্ত্রবৎ কাজ করেন—তাঁদের যদি শিল্পবোধ শিল্পবিচার না থাকে—তাহলে সেটাও ভাল ছবির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ছবি যাঁরা দেখেন—কেই বা না দেখে ?—তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন যে ছবির অধিকাংশ দৃশ্যই একই দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখিয়ে ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়। এই খণ্ডগুলিকে shots বলা হয়, এবং এইভাবে ভেঙে দেখানোর রীতি চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব রীতি। এর আগে

কোনো শিল্পে এর প্রয়োজন ছিল না। এটা খামখেয়ালের রীতি নয়, এবং বৈচিত্র্য আনাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর শিল্পগত উদ্দেশ্য আছে, ভাবগত সার্থকতা আছে।

একটি চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে তার শটগুলি বিশ্লেষণ করলে এই রীতির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কিছুটা বোঝানো যাবে। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের অন্যান্য ছোটবড় সমস্যারও কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এই উদাহরণ থেকে এমন কোনো তত্ত্বের হদিস পাওয়া যাবে না যার একটা ব্যাপক প্রয়োগ চলতে পারে। অন্যান্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রেরও কোনো অব্যর্থ থিওরি বা ফরমূলা নেই। কাহিনী অনুযায়ী, পরিচালকের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী, চলচ্চিত্রের রীতি পাল্টাতে বাধ্য। আবার একই কাহিনীর একই দৃশ্য বিভিন্ন পরিচালকের ভাষা প্রয়োগের রকমফেরে বিভিন্ন রূপ নেবে এটা বলাই বাহুল্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'পথের পাঁচালি' ছবির একটি দৃশ্য-পর্যায় নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। উপন্যাসে বিভূতিভূষণ দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্‌হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপনমনে বলিল—উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবনকাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েছে অবস্থা!—পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল, ওমা দুগ্‌গা—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারি পুঁটুলিটি নামাইয়া লইয়া বলিল—এসো ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃশ্যপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোন খট্‌কা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিবে—দুর্গা আসিয়া বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি হরিহর তাড়াতাড়ি পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং 'সচিত্র চণ্ডী মাহাত্ম্য' বা 'কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া চমক লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—বেল কাঁঠালের চাকি বেলুন হয়েছেই এবার। পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারদিকে চাহিয়া বলিল, কই, অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল——ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!"

'পথের পাঁচালি' চিত্রনাট্যে উপরোক্ত ঘটনা এইভাবে সাজানো হয়েছিল:

১। মেঘলা দিন। মেঠো রাস্তা।

Long Shot: অপু গাঢ় রঙের চাদর গায়ে কেরোসিনের খালি বোতল হাতে

রাস্তা দিয়ে হেঁটে দূরে চলে যায়।

[আবহসঙ্গীত চলছে]

২। মেঘলা দিন। ইন্দির ঠাকুরুণের দাওয়া।

Close up : উনুনে বসানো হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। ফুটন্ত ফ্যান ফুলে উঠে প্রায় উপচে পড়ে। হাঁড়ির ঢাক্না ওঠা-নমা করছে। Tilt up : সর্বজয়ার মুখ। ডান হাতে থুতনিটা ভর করে সে উবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি উদাস, নিষ্পলক।

[আবহসঙ্গীত চলেছে]

৩। মেঘলা দিন। সর্বজয়ার বাড়ির উঠোন।

Med Shot : উঠোনের দরজা দিয়ে একটি ১০/১২ বছরের মেয়ে (বিনি) এসে ঢুকল। তার হাতে ঝুড়িতে সবজি।

সে সর্বজয়ার দাওয়ার পাশে এসে দাঁড়াল। (সর্বজয়াকে দেখা যাচ্ছে না।)

বিনি : নতুন খুড়িমা!

[আবহসঙ্গীত চলেছে]

৪। মেঘলা দিন। উঠোন থেকে ইন্দিরের দাওয়ার দিকে দেখছি।

Med Shot : বিনি ডানদিকে Foreground-এ ক্যামেরার দিকে পিঠ করে। সর্বজয়া বাঁ দিকে দূরে বিনির দিকে পিঠ করে সেইভাবেই বসে আছে।

বিনি : নতুন খুড়িমা!

সর্বজয়া নিরুত্তর।

বিনি : মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এই এইখেনে রাখলুম।

বিনি ঝুড়িটা হাত থেকে দাওয়ায় নামিয়ে রাখে।

[আবহসঙ্গীত চলেছে]

৫। মেঘলা দিন।

Close Shot : বিনি ঝুড়িটা রেখে সর্বজয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে দরজার দিকে পিছিয়ে যায়।

[আবহসঙ্গীত Fade out করে]

Dissolve to

৬। মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাঁশবন।

Long Top Shot : দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর : অপু!

৭। মেঘলা দিন। ইন্দিরের দাওয়া।

Close up : হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার reaction —গালটা হাত থেকে সামান্য সরে গিয়ে শাঁখাটা আলগা হয়ে একটুখানি নীচের দিকে নেমে এল।

৮। মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

Med Shot : হরিহর এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। একটা আমডাল ভেঙে পাঁচিলের উপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়েছে।

হরিহর : (স্বগত) ইস্‌ আর ক'টা দিন সবুর সইল না?

হরিহর ডালটা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসে—Camera সঙ্গে সঙ্গে Pan করে।

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তার ভগ্ন কোঠার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। Camera আর Pan করে না—ভাঙা পাঁচিলের পিছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া।

[নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ]।

কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে Long-এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌছেছে। সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক ওদিক চায়।

হরিহর : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) খোকা! দুর্গা!

সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহর : ওঃ—তুমি আছ!

সর্বজয়া : এসো·····

হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

৯। মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া।

Med Shot : হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাত থেকে টিনের অ্যাটাচিকেস ও পুঁটলি দাওয়ার মেঝেতে নামিয়ে রাখল ; তারপর সে হাতের কব্জিগুলো রগড়ে নিয়ে ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

হরিহর : কেমন আছ ?

সর্বজয়া ঘটি থেকে হরিহরের পা ধোয়ার গাড়ুতে জল ঢালল, তারপর ঘর থেকে একে একে খড়ম, পিঁড়ি ও গামছা এনে গাড়ুর পাশে রাখল।

হরিহর : এরা সব বেরিয়েচে বুঝি ?

সর্বজয়া কোনো কথা না বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। হরিহর তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে থামায়।

হরিহর : ওকি যাচ্ছ কোথায় ? জিনিসগুলো এনেচি একবার দ্যাখো!

সর্বজয়া থামে। হরিহর উবু হয়ে বসে পুঁটলির গেরো খুলতে আরম্ভ করে।

১০। মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া।

Med Close Shot : সর্বজয়া foreground-এ ক্যামেরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে হরিহর দাওয়ায় বসে পুঁটলি খুলছে।

হরিহর : আগে আসতে পারলে কি আর আসতুম না ?......বাব্বা, কম ঘোরান ঘুরিচি ?......শেষটায় বিষ্ণুপুরে এসে ভাগ্যটা খুলে গেল—তাই, এই দ্যাখো—চড়কের মেলা থেকে লক্ষ্মীর পট আনতে বলিচিলে ? কেমন কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে এনিচি। আর এই......কাঁঠাল কাঠের জিনিস—

চাকি-বেলুন রেখে হরিহর একটা ডুরে শাড়ি সর্বজয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

হরিহর : আর এই দ্যাখো—

১১। মেঘলা দিন।

Close up ; দুর্গার ডুরে শাড়ি।

হরিহর : (নেপথ্যে) দুর্গার জন্য কেমন......

সর্বজয়ার হাত শাড়িটা আঁকড়ে ধরে। শাড়ি সমেত হাত উপর দিকে ওঠে,

ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে Tilt up করে।

সর্বজয়ার মুখ কান্নার আবেগে বিকৃত হয়ে যায়। সে দাঁত দিয়ে শাড়িটাকে কামড়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে।

[কান্নার শব্দের বদলে তার সানাই-এর তার-সপ্তকে করুণ সঙ্গীত]

১২। মেঘলা দিন।

Med. Close Shot; (Same angle as 10)

সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে। হরিহর তীব্র উদ্বেগে সর্বজয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সর্বজয়া মেঝেতে ঢলে পড়ে।

[তার সানাই-এ আবহসঙ্গীত]

১৩। মেঘলা দিন।

Close Shot : সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। হরিহর তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ভাবটা —কী হল? কী হল?

সর্বজয়া মাথা নেড়ে জানায়—দুর্গা নেই! Camera Truck Forward করে হরিহরের মুখের দিকে যায়।

হরিহর বুঝতে পেরেছে। সে হতভম্বের মতো ওঠার চেষ্টা করে—তারপর ধপ্ করে বসে পড়ে কান্নার বেগে নুয়ে পড়ে! Camera Truck Back করে প্রথম জায়গায় পিছিয়ে যায়।

হরিহর আর্তনাদ করে ওঠে—

হরিহর : দুগ্‌গা! দুগ্‌গা মা!

[তার-সানাই সঙ্গীত]

১৪। হরিহরের ভিটার পিছনের পুকুর।

Med. Shot : অপু তেলভরা বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিহর : (নেপথ্যে) : দুগ্‌গা মা!

অপু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে—কেমন যেন অসহায়, থতমত ভাব। ক্যামেরা দ্রুত Truck Forward করে অপুর মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

Fade out.

[তার সানাই সঙ্গীত Fade out করে]

অপুর পাঠশালায় যাবার দিন থেকে শুরু করে দুর্গার মৃত্যু অবধি এক বছর সময় কল্পনা করে চিত্রনাট্যের ঘটনাগুলিকে ঋতু অনুসারে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। চৈত্রের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার অসুখ। সেই থেকে হরিহরের ফিরে আসার দিন ঘটনাগুলি সবই মেঘলা দিনে তোলা হয়েছিল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে রোদ হয় না তা নয়—কিন্তু উপন্যাসের এই অংশের যে নিরবচ্ছিন্ন ভারাক্রান্ত mood, ছবির আলোতে তার প্রতিফলন মেঘলা দিনে সুটিং ছাড়া সম্ভব নয়। ছবিতে সময়ের দিক দিয়ে ঘটনাটির দৈর্ঘ্য পাঁচ মিনিট।

তিনদিনের শুটিং-এ দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল, প্রতিটি শটই প্রায় দুই কি তিনবার

করে নেওয়া হয়েছিল। এটা চলচ্চিত্র রচনার স্বাভাবিক নিয়ম।

এইবারে শটগুলি তলিয়ে দেখা যাক।

Long Shot ; দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্ব অনুসারে শট-এর বিভিন্ন নাম চালু আছে। মানুষের থুতনি থেকে মাথা, বা আরো কম অংশ যদি ছবিতে দেখানো হয়, তাকে বলে Big close up. মাথা থেকে কোমর অবধি Close up, পা অবধি Med. Shot। এর পরে Med. Long Shot ও Long Shot.

এই শটটিতে অপুর নিঃসঙ্গ অসহায়তা ফুটিয়ে তোলার জন্য খোলা মাঠের পরিবেশে এই Long Shot। ঠিক এই মেঠো পথ দিয়েই এক বছর আগে অপুকে দুর্গার হাত ধরে পাঠশালায় যেতে দেখানো হয়েছিল—সুতরাং দুর্গার অভাবটা দর্শকের কাছে আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

২। এর আগের শট এবং এই শট-এর মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান বোঝানোর জন্য Dissolve-এর ব্যবহার। Dissolve-এ একটি ছবি আস্তে আস্তে মুছে যায় এবং আরেকটি তার জায়গা নেয়। এইভাবে না গিয়ে সরাসরি শট থেকে শট-এ গেলে তাকে Cut বলে। Cut -এর চেয়ে Dissolve-এর পরিবর্তন স্বভাবতই কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত।

হাঁড়ির ঢাক্‌নার ওঠা-পড়া, সর্বজয়ার চোখের উদাস দৃষ্টি, এসব কাছ থেকে না দেখালে বোঝানো সম্ভব হবে না মনে করে এখানে Close up-এর ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া এর আগের শট-এর খোলা মেঠো দৃশ্যের প্রসারতার পর Close up-এর এই সঙ্কোচন একই করুণ সুরে ছন্দের বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করেছিল।

ক্যামেরার দৃষ্টিকে উপর-নীচ বা পাশাপাশি ঘোরাবার বন্দোবস্ত আছে। প্রথমটিকে Tilting ও দ্বিতীয়টিকে Panning বলা হয়।

এই শট-এ ঢাকনি-চাপা ফুটন্ত ভাতের সঙ্গে সর্বজয়ার রুদ্ধ শোকদগ্ধ মনের একটা সহজ উপমা দেবার সুযোগ হয়েছিল।

৩। বিনিকে এ-দৃশ্যে আনার প্রধান কারণ এই যে, সর্বজয়ার দুর্দিনে তার প্রতিবেশীরা যে তাকে সাহায্য করছে সেই তথ্যটি জ্ঞাপন করা।

বিনিকে প্রথম দেখি Med. Shot-এ, তারপর সে হেঁটে এগিয়ে এসে যখন দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে তখন সে প্রায় close up অবস্থায়। বিনি সর্বজয়াকে ডাক দিয়ে জবাব পায় না। সর্বজয়ার অভিব্যক্তি কি তাও আমরা জানি না, কারণ এই শট-এ সর্বজয়াকে দেখা যাচ্ছে না। তার সঙ্গে বিনির দূরত্ব কতখানি তা বোঝবারও কোনো উপায় নেই।

এই দুটি বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই এর পরের শট।

৪। এই শট-এ সর্বজয়া ও বিনি দুজনকে একসঙ্গে (two-shot) দেখতে পাওয়ার দরুন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা গেল; দুজনের মধ্যে দূরত্ব যথেষ্ট, কিন্তু তবুও দুজনকে একসঙ্গে দেখাতে হবে বলে Med. Long shot-এর প্রয়োজন হল। বিনির ডাকে সর্বজয়া নিরুত্তর—এতে তার শোকের গভীরতা প্রকাশ পেল।

এ শট-এ বিনির মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের জানবার কৌতূহল হয় সর্বজয়ার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে বিনির মুখের ভাব কেমন হয়। অর্থাৎ ক্যামেরার

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করে এবার বিনির মুখের সামনে যেতে হবে। এক শট থেকে আরেক শট-এ যাবার মুহূর্তটিও সাবধানে বাছতে হবে।

৫। আমরা শট পরিবর্তন করলাম বিনির ঝুড়ি রাখার ঠিক মাঝ অবস্থায়—যাতে রাখার প্রথমে অবস্থাটা দেখি এক শট-এ এবং বাকি অবস্থাটা পরের শট-এ। শুটিং-এর সময় অবশ্যি দুটো শটেই ঝুড়ি রাখার actionটি পুরো করে নিতে হয়। সম্পাদক পরে বাড়তি অংশটি ছেঁটে বাদ দেয়।

এইভাবে দেখানোর সুবিধা এই যে, ঝুড়ি নামানোর দিকে দৃষ্টি থাকায় কখন যে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ পালটে গেল দর্শক সেটা খেয়ালই করেন না।

চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক কারসাজিগুলো দর্শক যাতে টের না পায় পরিচালকের সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সম্পাদনার সাবলীলতা এই কারসাজিগুলোকে লুকিয়ে রাখতে অনেকটা সাহায্য করে।

বিনির চোখের চাহনি ও তার পিছু হাঁটার ভঙ্গি দেখে আমরা বুঝলাম যে সে অবাক হয়েছে, হয়তো কিঞ্চিৎ ভয়ও পেয়েছে।

৬। এর আগের শট আর এই শট-এর মাঝখানে আরেকটা dissolve। এই dissolve-এর মানে দাঁড়ায় এই—বিনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে হরিহর আসছে।

হরিহর এসে দুর্গার মৃত্যুসংবাদ পাবে—এই নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য স্বভাবতই দর্শক সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। হরিহর আসছে এ খবরটি দর্শককে জানিয়ে মৃত্যুসংবাদের চরম মুহূর্তটি বিলম্বিত করে নাট্যরস ঘন করার চমৎকার সুযোগ এখানে।

১৬ ফুট উঁচু বাঁশের মাচার উপর থেকে Long shot নিয়ে প্রথম দেখানো হল যে হরিহর দূর থেকে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আবহসঙ্গীত থেমে যাওয়াতে একটা থমথমে ভাব আপনা থেকেই কিছুটা এসে পড়ে। কোনো শব্দই নেই, যেন সমস্ত প্রকৃতিই রুদ্ধশ্বাসে চরম tragic মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে।

এই নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ দূর থেকে ছেলেমেয়ের নাম ধরে হরিহরের স্নেহপূর্ণ ডাক। সর্বজয়া কি সে ডাক শুনেছে?

৭। শুনেছে। এখানে তার অভিব্যক্তি কী হবে? বাড়াবাড়ি কিছু হওয়া অসম্ভব, কারণ কান্নার বাঁধ এত সহজে ভাঙতে পারে না। তাই সামান্য একটা movement, এবং তাই close up-এর প্রয়োজন। সাদা শাঁখাটা হাত দিয়ে গালের সঙ্গে চাপা ছিল—হাতটা সামান্য একটু নড়াতে শাঁখাটা আলগা হয়ে ইঞ্চিখানেক নেমে এল; এই যথেষ্ট কারণ এর আগে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনড় অবস্থায় দেখেছি। এই শাঁখার দোলাই যেন তার বুকের দোলা। এতক্ষণে হরিহর কোথায়?

৮। সে তার বাড়ির পাঁচিলের ধারে। পাঁচিলের অবস্থা দেখে সে আক্ষেপসূচক একটা স্বগতোক্তি করে—যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই (উপন্যাসে যেন একটু বেশি আছে)। নাট্যরস আরো জমে। হরিহর ভাবছে তার কোঠার ভাঙনই বুঝি তার চরম ট্র্যাজিডি।

নাট্যমুহূর্ত বিলম্বিত করার জন্য শটটিকে প্রায় দেড় মিনিট ধরে রাখা হয়েছিল। ঘটনা নেই—কেবল গরুর জাবর কাটা। যেন ঝড়ের পূর্বাবস্থা।

শট-এর গোড়ায় হরিহর Med. অবস্থায়; শট-এর শেষে সে হাঁটতে হাঁটতে long-এ চলে গেছে।

সে যখন সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় উঠছে—এই ওঠার মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা শট পরিবর্তন করে একেবারে—

৯। দাওয়ার উপরে চলে এলাম। সিঁড়ির দুই ধাপ এক শট-এ এবং বাকি দুই ধাপ পরের শট-এ ওঠায় দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন চোখে লাগল না। এই শট-এ হরিহরের ইতস্তত প্রশ্ন ও সর্বজয়ার দীর্ঘায়িত action—জল ঢালা, পিঁড়ি আনা, গামছা আনা, চটি আনা ইত্যাদি—দর্শককে অধীর করে তোলে। কখন কী ভাবে হরিহর এই সাংঘাতিক সংবাদটি অবগত হবে?

১০। হরিহরের পুঁটলি খোলার শুরুতেই শট-পরিবর্তন। এবারে সর্বজয়ার মুখ সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু close up-এর সময় এখনো আসেনি।

হরিহর দুর্গার শাড়ি প্রথমেই দেখায় না। দুটো জিনিস দেখানোর পরে শাড়িতে আসে।

১১। শাড়ি। এই তো close up-এর সময়!' দুর্গার শাড়ি হরিহর নিয়ে এসেছে। দুর্গা আর নেই। হরিহর তা জানে না। সে অম্লানবদনে শাড়িটা সর্বজয়ার দিকে এগিয়ে দেয়। এদিকে যে সহিষ্ণুতা এতক্ষণ সর্বজয়াকে ভেঙে পড়তে দেয়নি—এখনও কি তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব?

কান্নার শব্দে কেমন একটা বীভৎসতা আছে যেটা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এই দৃশ্যে স্বাভাবিক শব্দের বদলে তার সানাই-এর তার-সপ্তকে পটদীপ রাগে একটি করুণ সুর বাজানো হয়েছিল। এ যেন কান্নারই সামিল। আমার বিশ্বাস এতে করুণরস ঘনীভূত হয়েছিল।

১২। এই শট-এ সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো শব্দই ব্যবহৃত হয়নি।

১৩। হরিহরের উপলব্ধির মুহূর্তটিকে জোর দেবার জন্য এখানে Camera তার মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরিহরও ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই দৃশ্যের বক্তব্য প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এইখানেই দৃশ্যটি শেষ না করে আরেকটি অতিরিক্ত শট দেওয়া হয়েছে।

১৪। অপুকে দিয়ে দৃশ্যের শুরু—অপুকে দিয়েই শেষ।

যদিও এই শটটি অন্য শটগুলির অনেক পরে নেওয়া হয়েছিল—ভাবের দিক দিয়ে একাত্ম হওয়ায়—এবং হরিহরের আর্তনাদ অপুর শট-এর উপর এসে পড়ায় এটি অনায়াসেই এর আগের শটটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই শটটির শেষে Fade out-এর অর্থ পূর্ণচ্ছেদ। ইমেজ ও শব্দ (এক্ষেত্রে যন্ত্রসঙ্গীত) ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—এবং কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর আবার নতুন ইমেজ, নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হয়।

সন্দীপ্ত. কর্ষিকী; ১৯৫৯

ডিটেল সম্পর্কে দু'চার কথা

এক বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প ছাড়া সব শিল্পেই বিষয়বস্তুর ব্যবহার হয়ে থাকে। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে যে বিমূর্ত রূপ সম্ভব, সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে তা সম্ভব কিনা, বা হলেও তা উঁচুদরের শিল্প হতে পারে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমি যে ডিটেলের কথা বলতে চাইছি, বিমূর্ত শিল্পে তার স্থান নেই। বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করা বা সমৃদ্ধ করাই এই ডিটেলের উদ্দেশ্য। স্থান কাল পাত্র ঘটনা মনের ভাব, সব কিছুর বর্ণনাতেই এই ডিটেলের প্রয়োজন হয়, এবং শিল্পীর অনুভূতির উপরেই এর প্রয়োগের সার্থকতা নির্ভর করে।

শিল্পীর চোখে দেখা বা শিল্পীর কানে শোনা বা মন দিয়ে অনুভব করা সাধারণ লোকের চেয়ে সূক্ষ্মতর ও নিবিড়তর হতে বাধ্য—তা না হলে তিনি শিল্পী হবেন কী করে? শিল্পীর এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ হয় ডিটেলের মধ্য দিয়ে এবং ডিটেলের সার্থক প্রয়োগেই বিষয়বস্তু বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ছায়াচিত্রেই ডিটেলের দৈন্য লক্ষ করে দুঃখ হয়, কারণ ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে ডিটেলকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা কমই আছে। সিনেমা-পূর্ব যুগের শিল্প-সাহিত্যের কথাই আরও বেশি করে বলছি। চলচ্চিত্রকে একান্তভাবে বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলা বলা হলেও তার রচনারীতি যে আংশিকভাবে প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যে অন্তর্নিহিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে চলচ্চিত্রোপযোগী ডিটেল বলতে আমি কী বুঝি সেটা বলা দরকার। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উপমার প্রাচুর্যের কথা সকলেই জানেন। এই উপমা জিনিসটা নেহাতই সাহিত্যের বস্তু। কালিদাস থেকে একটা উদাহরণ দিই। রঘুবংশমে অজ ও ইন্দুমতীর বিয়ের বর্ণনা আছে। স্বয়ংবর-সভায় ইন্দুমতী অজের গলায় মালা দিলেন। কালিদাস বলছেন—

> 'তখন সেই স্বয়ংবর সভায় একদিকে আনন্দবিকশিত বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ এবং অপরদিকে ভগ্নমনোরথ নৃপতিমণ্ডলী অবস্থান করাতে বোধ হইল যেন প্রাতঃকালে সরোবরের একদিকে বিকশিত পদ্ম-কানন এবং অপরদিকে মুদ্রিত কুমুদবন বিদ্যমান রহিয়াছে।'

এ হল কাব্যের উপমা। চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর ঠিক পরেই কালিদাস বিবাহের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং একের পর এক চমকপ্রদ অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক, চিত্রধর্মী ডিটেলের সাহায্যে এই ঘটনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। নগরবাসীদের মনে এই শোভাযাত্রা কি রকম চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল, সেটাই বোঝান কালিদাসের উদ্দেশ্য—

> 'কোন রমণী দ্রুতগতিতে গবাক্ষ-সন্নিধানে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কবরীবন্ধন খুলিয়া গেল এবং তাহা হইতে মাল্যদাম স্খলিত হইয়া পড়িল, তিনি হস্ত দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখিলেন, তাহা যে বন্ধন করিতে হইবে সে চিন্তা তাহার মনে উপস্থিত হইল না···বেশবিন্যাসকারিণী হস্ত দ্বারা কোন রমণীর চরণে অলক্তক রঞ্জিত করিতেছিলেন, তিনি সেই আর্দ্রপদ আকর্ষণপূর্বক বিলাসগতি বিসর্জন করিয়া গবাক্ষ সমীপে গমন করিলেন; গবাক্ষ পর্যন্ত সমস্ত পথ লাক্ষারঞ্জিত চরণচিহ্নে চিহ্নিত হইল। কোন রূপবতীর দক্ষিণ নেত্রে অঞ্জন প্রদত্ত হইয়াছিল, বাম নয়ন অঞ্জনশূন্য ছিল; তিনি সেই অবস্থাতেই কজ্জল-শলাকা লইয়া গবাক্ষ সমীপে গমন করিলেন।···কোন রমণী অর্ধগ্রথিত কাঞ্চীদামসহ ত্বরিতবেগে গাত্রোত্থানপূর্বক দ্রুত বেগে গমন করাতে পদে পদে কাঞ্চীদাম হইতে মণিসকল খুলিয়া পড়িতে লাগিল; অবশেষে তাহার অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল···' ইত্যাদি।

রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যের বিপুল আয়তনের একটা প্রধান কারণ হল ডিটেলের প্রাচুর্য। বিশেষত মহাভারতকে চলচ্চিত্রসুলভ ডিটেলের স্বর্ণখনি বলা চলে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষে গান্ধারী তাঁর দিব্যচক্ষু দিয়ে রণভূমির অবস্থা দেখে কৃষ্ণকে তার বর্ণনা দিচ্ছেন—

> 'দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তাক্ত-দেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই যে, নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষণ-জননী দুর্যোধন-পত্নী মস্তকে করাঘাত করে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ ও দেহহীন মস্তক দেখে অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ—আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃধ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না।···'

ভারতীয় চিত্রশিল্পেও এই ডিটেলের ঐতিহ্য অনেক দিন অটুট ছিল। বাঘ অজন্তার গুহায় এর নমুনা আছে। মুগল-রাজপুত মিনিয়েচার ছবিতে আছে। ন্যাচারেলিজম্-এর পথে না গিয়েও কীভাবে মানুষ ও প্রকৃতির ভাব কেবলমাত্র ডিটেলের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত এসব ছবিতে আছে। আকাশের উপর মাত্র পাঁচ-সাতটি সমান্তরাল নিম্নগামী ফোঁটার লাইন কেটে মিনিয়েচার-শিল্পী বৃষ্টি বুঝিয়েছেন; কেবলমাত্র নায়িকার উত্তরীয়ের উত্তাল ভঙ্গিতে ঝড় বুঝিয়েছেন; প্রেম বিরহ আনন্দ বিষাদ ক্রোধ লজ্জা ঈর্ষা ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

মনের ভাব শুধুমাত্র দেহের ভঙ্গিমার ডিটেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এইসব প্রাচীন ছবি থেকে তাই চিত্র-পরিচালকের অনেক কিছু শেখার আছে।

বাংলা দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও অজস্র ডিটেলের দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টির' বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—

> ...সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
> পাঁকে গাড়া গেল গাড়ি উট তার সাথী ॥
> ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলোয়ার।
> ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
>
> ...
>
> বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
> কুজরাণী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
> ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
> ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে ॥
>
> ...
>
> ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
> কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥

ডিটেল বলতে যে শুধু চোখে দেখা জিনিসের বর্ণনা বোঝায় তা নয়। সুনির্বাচিত শব্দের বর্ণনাও ডিটেলের অন্তর্গত—এবং সেখানে সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে একটা সরাসরি যোগস্থাপন করা প্রয়োজন। প্যারীচাঁদের উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে একটা উদাহরণ দিই—

> "শ্যামের নাগাল পাইলাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই'—টক্ টক্ পটাস্ পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিটকারী দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাং সপাং মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটা হনহন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়িকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়িখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেতো ঘোড়ার বাবা—পক্ষীরাজের বংশ—টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে। কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুইটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ির হেঁকোচে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন।..."

শব্দের ডিটেলে এই কমিক বর্ণনা যে আরও অনেক বেশি রসাল হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? চলচ্চিত্রেও এই জাতীয় ডিটেল ঠিক এইভাবেই কাজ করবে এটাও অনুমান করা যায়।

প্রাক্-চলচ্চিত্র যুগের আগে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে দুজনের ডিটেল-সচেতনতার কথা উল্লেখ করতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ। বিষবৃক্ষ

উপন্যাসে নগেন্দ্র দত্তের বাড়ির উঠোনের প্রায় একপৃষ্ঠাব্যাপী একটি বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, এখানে লেখকের শিল্পসৃষ্টির চেয়ে তথ্য পরিবেশনের তাগিদটা কিছু কম নয়। কিন্তু বঙ্কিম জানতেন যে কাহিনী কাল্পনিক হলেও পাঠকের মনে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ডিটেলের সাহায্যে তার একটি বাস্তব পটভূমিকা রচনা করে নিতে হয়।

অবনীন্দ্রনাথকে প্রধানত যে শিল্পরীতি প্রভাবিত করেছিল তার মূলে ছিল আমাদের বাংলার রূপকথা। তাঁর নিজের অধিকাংশ রচনাই এই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে। রূপকথায় ডিটেল জিনিসটার প্রয়োজন সব থেকে বেশি, কারণ তাতে যেসব কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয় ডিটেল ছাড়া তার অধিকাংশেরই কোন অস্তিত্বই নেই। রাক্ষস জিনিসটা যে বাস্তবে নেই, এ কথা আমরা সকলেই মানি; কিন্তু শিশুমনে রাক্ষসের একটা ডিটেল-সংবলিত স্পষ্ট চেহারা ধরা আছে—

'পিঠখানা তার কুলো
দাঁতগুলো তার মূলো, কান দুটো তার নাটা নাটা
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।'

আমরা জানি যে, রূপকথার রাজা শুধু বড় রাজা নন, তার 'হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, কুঠরী-ভরা মোহর।' আমরা জানি, সুয়োরানীর 'সোনার খাটে গা, রুপোর খাটে পা', আর 'দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না।' রাজার যদি দাপট থাকে তাহলে আমরা জানি যে তার রাজ্যে 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়।' এক একটি ভাব প্রকাশের জন্যে এক একটি ডিটেল; চিত্রের সাহায্য ছাড়া ভাবের প্রকাশ নেই বললেই চলে। রূপকথা ছেড়ে গীতি-কাব্যের মধ্যেও দেখা যাবে ডিটেলের ছড়াছড়ি। লেখক, কথক, কবিয়াল, পাঁচালিকার—সকলেই ভাব প্রকাশে বার বার ছবির আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ চিত্র রচনাই যাঁদের কাজ, তাঁরা ছবির কথা ভুলে যাবেন, ডিটেলের কথা ভুলে যাবেন, এর চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কী হতে পারে?

দেশ, বিনোদন: ১৯৬৮

চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে

আমরা সাধারণত যেসব ছবি দেখি তার অধিকাংশই বাস্তবধর্মী, সংলাপ সংবলিত ছবি। সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও সংলাপবিহীন ছবির দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়; কিন্তু তার সংখ্যা এতই কম যে, তাকে প্রচলিত রীতির মধ্যে আদৌ গণ্য করা যায় না। কিছু ছবি আছে—যেমন কার্টুন ছবি, বা গীতিনাট্যমূলক ছবি বা রূপকথাসুলভ কল্পনাশ্রয়ী ছবি—যাতে বাস্তবধর্মী সংলাপের কোন শিল্পগত প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ছবিতেই আমরা বাস্তবধর্মী সংলাপ শুনি, বা শোনার আশা করি।

চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দুটি কাজ। এক, কাহিনীকে ব্যক্ত করা; দুই, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে-কাজ হয়। পরিবেশ বর্ণনার জন্য কথার প্রয়োজন নেই, ছবিই সে-কাজ করে। চরিত্র-বর্ণনার আকৃতিগত দিকটা ছবিতেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির দিকটা কিছুটা অভিনেতার ভাবভঙ্গি ও বাকীটা তার সংলাপে প্রকাশিত হয়। ছবি দিয়ে যা বলা সম্ভব হল না, সংলাপে কেবল সেইটুকুই বলার চেষ্টা করা উচিত। নতুন চিত্রনাট্যকার সব সময় এ-কথাটি মনে রাখেন না, তাই তাঁর কাজে প্রায়ই অতিকথনের দোষ লক্ষ করা যায়। সংলাপের মাত্রা নির্ণয় করা রীতিমত কঠিন কাজ। এই মাত্রাবোধ একবার আয়ত্ত হলে চিত্রনাট্য রচনার পথ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এ ধরনের সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকেই মানায় বেশি। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়। নাটকের পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের মিল এতই সামান্য যে, নাটকের দর্শক পাত্র-পাত্রীর মুখে বাস্তবজীবনের স্বাভাবিক কথোপকথন আশাই করে না। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংলাপও এখানে একটা সরলীকৃত, নাটকসর্বস্ব রূপ নেয়। আমাদের দেশের চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ই এই পার্থক্যটি মনে রাখেন না। বিশেষত নায়ক-নায়িকার মুখে যেসব কথা প্রয়োগ করা হয়, সে সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকেই মানায় বেশি। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়। নাটকের তাগিদে এইসব নায়ক-নায়িকার পদস্খলন ঘটে, তবুও তাদের বাক্‌স্ফূর্তির লাঘব হয় না।

সংলাপ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহলে অভিনয় স্বাভাবিক হওয়া মুশকিল। বাস্তব জীবনে মানুষ একই বক্তব্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে। একই কথা অলসমুহূর্তে একভাবে, কর্মরত অবস্থায় আরেকভাবে ; এমন কি গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত অবস্থায় একভাবে এবং শীতে কম্পমান অবস্থায় আরেকভাবে ব্যক্ত হয়। নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় মানুষের কথার লয় হয় বিলম্বিত, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের কথা কেটে যায়, বাক্য উথিত হয় নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে।

মানুষে মানুষে শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও পার্থক্য এসে পড়ে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী বাংলা ভাষায় ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে কেউ কেউ ইংরিজি শব্দ বর্জন করার অভ্যাস করছেন, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। শিক্ষিত বাঙালির সংলাপে ইংরিজি কথার ব্যবহার তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চিত্রনাট্য রচনার সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে, চিত্রনাট্যকার তার নিজস্ব সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে, তার চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ করে সেই চরিত্রের সত্তাটিকে সংলাপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলবেন। আরেকটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে, চলচ্চিত্রে সময়ের দাম বড় বেশি। যত অল্প কথায় যত বেশি বলা যায়, ততই ভালো ; আর কথার পরিবর্তে যদি ইঙ্গিত ব্যবহার করা যায়, তবে ত কথাই নেই।

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে বাস্তবধর্মী সংলাপ রচনায় অনেকেই দক্ষ, যদিও সে-সংলাপ যে সব সময় অপরিবর্তিত রূপে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা যায় তা নয়। কিন্তু কোন চিত্রনাট্যকার যদি সাহিত্যের সংলাপ থেকে তালিম নেবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি একজন সাহিত্যিকের নাম নির্দ্বিধায় করতে পারি। তিনি হলেন স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার এত বড় গুরু আর কেউ নেই। বিভূতিভূষণের সংলাপ পড়লে মনে হয় যেন সরাসরি লোকের মুখ থেকে কথা তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিয়েছেন। এ-সংলাপ এতই চরিত্রোপযোগী, এতই revealing যে, লেখক নিজে চরিত্রের আকৃতির কোন বর্ণনা না দিলেও কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের চেহারাটি যেন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তি না থাকলে এ ধরনের সংলাপ সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য, চিত্রনাট্য রচয়িতার পক্ষেও এ দুটি গুণ অপরিহার্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়, ১৯৬৩

pathagar.net

আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে

সিনেমার আদিযুগে, অর্থাৎ নির্বাক ছবির শৈশবাবস্থায়, আবহসংগীত বলে কিছু ছিল না। ছবি দেখার সময় তখনকার দিনের দর্শক শুনতে পেতেন কেবল প্রোজেক্টর যন্ত্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ। এই শব্দ রসগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে দেখে, সেই শব্দ ছাপিয়ে পিয়ানো বা অর্গ্যান বাজানোর রীতি প্রবর্তিত হল। বলা বাহুল্য, বাজনা যাতে ছবির ভাবের সঙ্গে সংগতি রাখে তার দিকে একটা দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হত। এই সংগতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রেক্ষাগৃহের মাইনে-করা পিয়ানো বা অর্গ্যানবাদকদের উপর। বাজিয়ে ছবি দেখতে দেখতে নিজের বুদ্ধি ও অভিরুচি অনুযায়ী গৎ বাজাতেন। ফলে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে একই ছবিতে বিভিন্ন আবহসংগীত আরোপিত হত।

গ্রিফিথই বোধহয় প্রথম পরিচালক যিনি এ-রীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে একটি নতুন উপায় আবিষ্কার করলেন। গ্রিফিথ সংগীত বুঝতেন ; তবে সুরকার ছিলেন না। তাই মৌলিক রচনার দিকে না গিয়ে বেটোফেন-মোৎসার্ট প্রমুখ প্রখ্যাত সুরকারদের রচনা থেকে প্রয়োজন মত অংশ বেছে নিয়ে তাঁর ছবির সঙ্গে বাজানোর জন্য একটি গোটা স্বরলিপি তিনি তৈরি করে দিতেন। এই স্বরলিপি যাতে অবিকলভাবে অনুসরণ করা হয় তার কড়া নির্দেশও তিনি দিয়ে দিতেন।

কোন্ দেশের কোন্ ছবিতে আবহসংগীত হিসেবে প্রথম মৌলিক স্বরলিপি লেখা হল তা আমার জানা নেই, তবে নির্বাক যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত আবহসংগীত ছিল আইজেনস্টাইনের পোটেমকিন ছবির জন্য রচিত জার্মান সুরকার এডমুণ্ড মাইজেলের স্বরলিপি। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে বার্লিন শহরে পোটেমকিনের প্রথম প্রদর্শনীতে ছবি ও সংগীতের জবরদস্ত সমাবেশ নাকি দর্শকের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। মাইজেলের সংগীত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভের সুযোগ পায়নি, কারণ রচনাটি ছিল অর্কেস্ট্রার জন্য, এবং পৃথিবীর খুব কম প্রেক্ষাগৃহের পক্ষেই একটি আস্ত অর্কেস্ট্রা মজুত রাখা সম্ভব ছিল।

সবাক যুগে আবহসংগীতে অর্কেস্ট্রার ব্যবহার চলচ্চিত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত হল। এখানে সংগীতের ব্যাপারে প্রেক্ষাগৃহের আর কোন দায়িত্ব রইল না। অর্কেস্ট্রা পোষণের ভার নিলেন স্বয়ং চিত্র প্রযোজক। হলিউডের প্রত্যেক

স্টুডিওতে কায়েমিভাবে একটি করে অর্কেস্ট্রা নিযুক্ত হল। ইউরোপের সেরা সুরকারেরা মার্কিনি স্বর্ণচুম্বকের আকর্ষণে হলিউডে এসে আস্তানা গাড়লেন। আবহসংগীতের কায়দাকানুনও এইসব সুরকারেরা প্রয়োজনের তাগিদে অল্পকালের মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেললেন।

সবাক যুগের শুরু থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে আবহসংগীতে অর্কেস্ট্রার ব্যবহার নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি। ক্রমে ক্রমে হলিউডেরই কোন কোন ছবিতে এই নিয়মের দু-একটি করে ব্যতিক্রম দেখা দিতে লাগল।

Carol Reed-এর The Third Man ছবিতেও আবহসংগীতে শোনা গেল কেবলমাত্র একটি যন্ত্র : Zither/High Noon ছবিতে শোনা গেল পুরুষকণ্ঠে গীত লোকসংগীত। কোন কোন ছবিতে (Louis de Rochemont প্রযোজিত Boomerang, House on the 92nd street, 31 Rue Madeleine) এমনও দেখা গেল যে আবহসংগীত সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে। ফরমূলার ভাঙন শুরু হল এইখানেই।

গত দশ বছরে ছায়াছবির রীতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তুর পরিধি বেড়েছে অনেক। ফলে বলার ঢং, ক্যামেরার ব্যবহার, সম্পাদনার কায়দাকানুন সবই বদলেছে। এই বদলের সঙ্গে তাল রেখে বদলেছে আবহসংগীতের ঢং। আজকের দিনের সুরকার জানেন যে ছবির মেজাজই আবহসংগীতের রূপ নির্ধারিত করে। কোন পুঁথিগত নিয়ম বা শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ এখানে খাটে না।

এখানে পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি। ছবির মূল সুরটি পরিচালকের চেয়ে বেশি ভালো করে আর কে জানবে? বিশেষত ছবি যদি নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে রচিত হয়; তাহলে সে ছবিতে আবহসংগীতের প্রয়োজন আছে কি না, বা, থাকলে তার প্রকৃতি কেমন হবে, তাপরিচালকেরই স্থির করা উচিত। কোন শক্তিমান পরিচালক যদি স্বাধীনভাবে কোন একটি সার্থক ছবি করে থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সে ছবির আবহসংগীত পরিচালকেরই নির্দেশের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। সুরকারকে পরিচালকের নির্দেশ নিতেই হবে, কারণ সংগীত এখানে কেবল সুরের প্যাটার্ন নয়। আদিযুগের পিয়ানো বা অর্গ্যানবাদকের মত আজকের চলচ্চিত্র-সুরকারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ছবির ভাবের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে সংগীত রচনা করা।

এই ভাব যে কেবলমাত্র ছবির বিষয়বস্তুতেই ব্যক্ত তা নয়। একই বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন জাতের ছবি সৃষ্টি হতে পারে—যেমন একই কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মেজাজের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সাহিত্যের মতই, ছবির জাত নির্ভর করে রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহারের উপর। পাত্রপাত্রীর সংলাপ, অভিনয়ের রীতি, ক্যামেরা ও শব্দের ব্যবহার, ছবির ছন্দ ও লয়, সবকিছুই ছবির ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। আবহসংগীত রচনার কাজ যেহেতু ছবির শেষ কাজ, সুরকারের পক্ষে পরিচালকের সহায়তা নিয়ে ছবির মূল সুরটি হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব নয়।

এখানে সুরকারকে একটি কথা মনে রাখতে হয়। সেটা হল এই যে, ছবি প্রধানত

চোখে দেখার জিনিস। দৃশ্যবস্তু ছাড়া ছবিতে যা থাকে তার মধ্যে প্রধান হল সংলাপ; কারণ কাহিনীর অনেকখানিই ব্যক্ত হয় সংলাপের মাধ্যমে। আরো কিছুটা বলা হয় যাবতীয় ধ্বনির সাহায্যে। এই বলার কাজে আবহসংগীতের কাজ সবচেয়ে পরে। কারণ সংগীতের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোন ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সব সুর বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হল ভাষার ব্যঞ্জক। চলচ্চিত্রের আবহসংগীতও ব্যঞ্জকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে—যদি তা সুপ্রযুক্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—ছবিতে সংগীতের প্রয়োজন আছে কি? কিসের অভাব পূরণ করে আবহসংগীত?

প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যবস্তু, কথা ও ধ্বনির সাহায্যে ছবিতে যা বলা হল, তার উপরে সংগীতের প্রলেপ দিয়ে বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট বা আরো আবেগময় করার প্রয়োজন যদি পরিচালক বোধ করেন, তবেই তিনি আবহসংগীতের আশ্রয় নেন। অন্যথা আবহসংগীতের ব্যবহার ছবির ক্ষতি বই উপকার করতে পারে না। আর এটাও ঠিক যে আবহসংগীতের প্রয়োগ ছবির কোন দোষ-ত্রুটি ঢাকতে পারে না। করুণ দৃশ্যে যদি পরিচালকের দোষে কারুণ্যের অভাব ঘটে থাকে তাহলে বেহালা বা তারসানাই বাদকের করুণতম স্বরোচ্ছ্বাসও সে অভাব পূরণ করতে অক্ষম।

ছবির ভাষা যেখানে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত, সেখানেই সুরকারের দায়িত্ব যায় বেড়ে। কারণ ভালো ছবিকে নষ্ট করার একটি উপায় হল বেমানান আবহসংগীত; আধুনিক পন্থায় রচিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছবিতে প্রাচীনপন্থী ফরমূলা সংগীতের ব্যবহারও ছবিকে নষ্ট করতে পারে। বিয়োগ দৃশ্যে Sad music, মিলন দৃশ্যে Happy music, অতর্কিত নাটকীয় মুহূর্তে Crash, 'কী হবে কী হবে' জাতীয় উৎকণ্ঠার মুহূর্তে 'Suspense music', এসব ফরমূলা এখনো আমাদের ছবিতে প্রচলিত। এক জাতীয় ছকে ফেলা ছবিতে হয়ত এছাড়া আর গতি নেই, কিন্তু নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে যারা ছবি করলেন, তাদের এ ধরনের আবহসংগীত বর্জন করতেই হবে।

বাংলা দেশের ছবিতে আবহসংগীতের যে প্যাটার্ন এতদিন চালু ছিল, তা কিছুটা বিদেশী ছবি ও কিছুটা যাত্রা থেকে নেওয়া। যাত্রা যে কটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে—তাতে মনে হয় যে যাত্রায় সংগীতের ব্যবহার একটা রীতিমত আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কেবলমাত্র দেশী যন্ত্রের ব্যবহারে যে সব সময়ে নাটকীয় মুহূর্তের উপযোগী সংগীত সৃষ্টি করা সম্ভব নয় সেটা যাত্রার সুরকার অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। বেহালা' ক্ল্যারিওনেট কর্নেট পিকোলো ইত্যাদি খাঁটি বিদেশী যন্ত্র বহুদিন থেকেই যাত্রায় ব্যবহার হয়ে আসছে। এসব যন্ত্রে যে-সুর বাজানো হত তা হল একেবারে ষোল আনা রাগসংগীতের গৎ। সংগীত হিসাবে তা অবিশ্যি কোনোদিনই সার্থকতা লাভ করতে পারেনি, কারণ বিলিতি যন্ত্রে দিশি গৎ বাজালে শ্রুতি ও মীড় বর্জন করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আবহসংগীতের সংগীত হিসাবে জাত বজায় রাখবার তাগিদ নেই। যাত্রার সুরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অভিনেতার উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোরালো

সংগীত রচনা। অথচ এক সরোদ ও বাঁশী বাদে সব ভারতীয় যন্ত্রেরই আওয়াজ অত্যন্ত মৃদু। সরোদের ব্যবহার বিপজ্জনক—কারণ সরোদের টঙ্কার ও সংলাপের ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘর্ষের ফলে স্বর বিকৃতির সমূহ সম্ভাবনা। এদিকে একমাত্র বাঁশী দিয়ে পুরো নাটকের কাজ চলে না। তাই যাত্রার সুরকার নির্দ্বিধায় বিলিতি যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এর ফলে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হলেও আবহসংগীত হিসাবে তার কার্যসিদ্ধির পথ প্রশস্তই হল।

আবহসংগীতের ব্যবহারে সংগীতের শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ নিয়ে গোঁড়ামি সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ নিছক সংগীত হিসাবে আবহসংগীতের মূল্যায়নের কোন প্রয়োজনই নেই। যেকোন যন্ত্রের দ্বারা ছন্দ বা সুর উত্থাপন সম্ভব, তারই ব্যবহার আবহসংগীতে চলতে পারে। সেতার সরোদ পাখোয়াজের সঙ্গে ঘটি বাটি পেয়ালা পিরিচ বাজিয়ে আমারই কোন ছবির সুর রচনা করেছিলেন রবিশঙ্কর। এ ধরনের প্রয়াস সংগীতের আসরে নীতিবিরুদ্ধ পাগলামো বলে মনে হত। কিন্তু এর ফলে যে আবহসংগীত রচিত হল, তা যদি ছবির সঙ্গে তাল রাখতে সক্ষম হয় তবে সে সংগীত শুধু সংগীত নয়—রসোত্তীর্ণও বটে।

সত্যি বলতে কি, রাগরাগিণীর শাস্ত্রীয় রূপ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছবিতে প্রায় নেই বললেই চলে। রাগরাগিণীর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। কোন ছবির পিছনে কোন পরিচিত রাগ যদি প্রচলিত পন্থায় বিস্তারিত হতে থাকে, তবে সে রাগসংগীত শ্রোতার মনকে ছবি থেকে সংগীতের মার্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। এ হলে যে আবহসংগীতের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না তা সহজেই বোঝা যায়। তবে আংশিকভাবে রাগরাগিণীর ব্যবহার চলচ্চিত্রে প্রচুর হয়েছে এবং সার্থকভাবেই হয়েছে। কোন কোন রাগরাগিণী সম্পর্কে সুরকারদের মধ্যে স্বভাবতই একটি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থা ও মানসিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে কোন কোন রাগরাগিণী একেবারে অদ্বিতীয়। উদাহরণস্বরূপ কিছু ভোরের রাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য আজকের নাগরিক জীবনে ভোরের বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে দিনের প্রথম আলোর উদ্ভাস যিনি দেখেছেন এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন—ললিত, ভৈরো, টোড়ি, রামকেলি, খট্ প্রভৃতি রাগের অতুলনীয় ভাব ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

সন্ধ্যার রাগ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা খাটে। সমস্ত দিনের মধ্যে দিন ও রাত্রের সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত দুটিই বোধহয় মানুষের মনে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ। তাই শ্রী পূরবী ধানেশ্রী ইত্যাদি রাগে সন্ধ্যার উদাস বিষণ্ণ ভাবটি এমন আশ্চর্যভাবে ধরা সম্ভব হয়েছে। দিনের অন্য প্রহরগুলির তেমন বিশেষ কোন চরিত্র নেই। তাই সারঙ্গ শুনে দুপুর বা বেহাগ শুনে রাত্রের কথা তেমন অব্যর্থ ভাবে মনে আসে না।

ছয় ঋতুর মধ্যে যে-দুটি সবচেয়ে কাব্যময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—বসন্ত ও বর্ষা—রাগরাগিণীতে এই দুটির রূপই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ফুটেছে। বলা বাহুল্য এই দুটি ঋতু মানুষের মনে যে বিশেষ ভাবগুলির সঞ্চার করে, রাগরাগিণী সেই ভাবগুলিকেই প্রতিফলিত করে। চলচ্চিত্রের সংগীতকারও এই বিশেষ ভাবগুলি

ফুটিয়ে তুলতে এইসব রাগের সাহায্য নেন।

এবারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলে আমার এ প্রবন্ধ শেষ করব। পথের পাঁচালি থেকে নিয়ে চারুলতা অবধি আবহসংগীতের নানান সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে আমাদের, এবং সাধ্যমত সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। পথের পাঁচালি ছিল গ্রাম্য পরিবেশের কাহিনী। কিন্তু তা বলে তা লোকসাহিত্য নয়। তার ভাষায়, তার মেজাজে রীতিমত sophistication আছে। তার চরিত্রবর্ণনে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ আছে। ছবিতেও অনুরূপ sophistication আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং এর আবহসংগীতে কেবলমাত্র গ্রাম্য যন্ত্রে গ্রাম্য সুর বাজানোর কোন সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করিনি। বাঁশী' গুপীযন্ত্র ঢোল ইত্যাদির সঙ্গে সেতার সরোদ পাখোয়াজ মেশাতে তাই রবিশঙ্কর দ্বিধা করেননি।

তিন কন্যার 'পোস্টমাস্টার'ও গ্রাম্য পরিবেশের ছবি। কিন্তু এর ভাব ও ভঙ্গী, এর কাহিনীর উপাদান, এর পাত্রপাত্রীর আচরণ ও কথাবার্তা—সবই ছিল অত্যন্ত সরল। তাই এর আবহসংগীতে বাঁশী/ দোতারা ও সারিন্দা—এই তিনটি যন্ত্র ছাড়া আর কোন যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করিনি।

জলসাঘরের বনেদি জমিদারী-মেজাজ এ ছবির আবহসংগীতের চরিত্র নির্ধারিত করেছিল। এই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে রাগসংগীতের একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে, এবং সে-যোগসূত্র সম্পর্কে আমরা সকলেই সচেতন। সুরকার বিলায়েৎ খাঁ সেতার সুরবাহার সরোদ সারেঙ্গী প্রভৃতি যন্ত্রে খানদানী রাগরাগিণী এ ছবিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

জলসাঘরের সংগীত রচনাকালে একটি তথ্য আবিষ্কার করা গিয়েছিল। সেটা এই যে আবহসংগীতে রাগাশ্রিত সুর ব্যবহার হলেও, তার সঙ্গে তবলার সঙ্গত একেবারেই অচল। তবলার শব্দ একটা আসরি মেজাজের ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে সংগীতের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যায়। আরো একটি শেখার বিষয় হল—আবহসংগীতে রাগাশ্রিত সুরের ব্যবহারে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানবার বাধ্যবাধকতা নেই। যদি দেখা যায় যে রাগ অবিকৃত রাখলেই ছবির ভাবটি সঠিক ফুটে ওঠে, তবে তা অবিকৃত রাখাই উচিত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ছবির কোন দৃশ্যে ভাব থেকে ভাবান্তরে যাওয়ার মুহূর্তে সংগীতেরও রাগ থেকে রাগান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে। রাগমালার সুদক্ষ পরিবেষণে যে আশ্চর্য নাট্যরসের সৃষ্টি হয় তা সংগীতরসিক মাত্রেই জানেন। চলচ্চিত্রের সুরকার এই রাগ পরিবর্তনের নাটকীয়তা চমৎকারভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

আবার কোন বিশেষ মুহূর্তে এমনও মনে হতে পারে যে রাগে আচমকা বেপর্দার প্রয়োগই হয়ত সেই মুহূর্তটিকে ফুটিয়ে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায়। এখানেও দ্বিধার কোন কারণ নেই। আসরে যা অর্বাচীন ও নীতিবিরুদ্ধ, ছবিতে তা সমীচীন ও শিল্পসম্মত হওয়ায় কোন বাধা নেই। আসল কথা, সুরকারকে মনে রাখতে হবে যে তাঁর আনুগত্য প্রধানত চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি, সংগীতশাস্ত্রের প্রতি নয়।

মহানগর বা কাঞ্চনজঙ্ঘার মত ছবিতে কতকগুলি নতুন সমস্যার সামনে পড়তে

হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাহিনী বাংলাদেশের একটি শ্রেণীবিশেষকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণীর পোষাক-আষাকে চলায়-বলায় ইঙ্গবঙ্গ উচ্চ মধ্যবিত্তের ছাপ সুস্পষ্ট। কাহিনীর ঘটনাস্থল হল দার্জিলিং শহর। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ইঙ্গবঙ্গ ভাব—এই দুটি মূল সূত্র থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আবহসংগীতের উদ্ভব। পাহাড়ী লোকসংগীতের সুর ইচ্ছামত ভেঙে দেশী ও বিলাতী যন্ত্রে একক ও সমবেতভাবে বাজিয়ে এ-ছবির মেজাজ আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কাঞ্চনজঙ্ঘার মত মহানগরেও প্রধান সমস্যা ছিল সংমিশ্রণের সমস্যা। এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র আরতি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বৌ। চাকরি তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে বাইরে। এর পরে পটভূমিকা পরিবর্তনশীল শহরের রাস্তাঘাট ট্রামবাস রেস্টুরেন্ট, ফিরিঙ্গি সহকর্মীর বাড়ি, আলিপুরের অভিজাত পরিবেশ, আধুনিক শীততাপনিয়ন্ত্রিত চাঁচাছোলা সওদাগরী আপিস—এসবই ঘুরেফিরে আসছে ছবিতে। এছাড়া আছে চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত, বৃদ্ধ বাপ সংক্রান্ত sub-plot ও আরো অনেক কিছু। একে উপাদানের প্রাচুর্য, তার উপরে ঘন ঘন পট পরিবর্তন। এ-ছবির স্কন্ধে অতিরিক্ত আবহসংগীতের ভার চাপিয়ে দর্শকের মনোবৃত্তিকে পীড়িত করা উচিত হবে না বলেই মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সামান্য যা সংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল তা কিছুটা নাটকের খাতিরে ও কিছুটা মুড-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

আজ অবধি যে-ক'টা ছবিতে আমি নিজে সংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে চারুলতার সংগীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এর একটা কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহসংগীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে কোন্ বা কোন্-কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে সেই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজলভ্য নয়। তাই সংগীতের কাজে এখনও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনও অনেক কিছুই। বিশেষত বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে, মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় বাড়িঘরদোরের চেহারায় কোন স্পষ্ট চরিত্র নেই—সবই যেখানে পাঁচমিশেলি খিচুড়ি, সেদেশের পটভূমিকায় আধুনিক ছবির আবহসংগীত রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।

এদিকে বিদেশে সংগীত নিয়ে চলেছে বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। বাদ্যযন্ত্র বর্জন করে শব্দবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ইলেকট্রনিক সংগীত রচনা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সব জাতের ছবিতে এ সংগীত খাপ খাবে না। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এইসব পরীক্ষার ফলে চলচ্চিত্রের সুরকার অনেক নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন। এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সিনেমাশিল্প সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত মন্তব্য করা অবশ্যই চলে না, তবে একটা কথা বেশ জোর দিয়েই বলা চলে যে, ভারতবর্ষে আবহসংগীত রচয়িতার সমস্যা দৈন্যের সমস্যা নয়, সেটা হল প্রাচুর্যের সমস্যা।

দেশ, বিনোদন: ১৯৬৪

দুটি সমস্যা

যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের সৃষ্টির পথ বন্ধ হয় তখনই যখন তাঁদের আর কিছু বলার থাকে না। যাঁরা পেন্টিং করেন, আক্রোর বাজারে এমন হতে পারে যে ভাল রং তুলির অভাবে তাঁরা যেমন-তেমন দিয়ে কাজ চালালেন। রং না থাকলে খড়ি আছে, খড়ি না থাকলে কলম-পেনসিল ত আছেই ; নন্দলাল বোসকে দাঁতন দিয়েও ছবি আঁকতে দেখেছি।

শিল্প-সাহিত্য যাঁদের পেশা, তাঁদের একধরনের কাজের চাহিদা কমে গেলে তাঁরা কাজের রীতি পালটে বাজারটা নতুন করে বাজিয়ে দেখতে পারেন। রীতি পালটানো মানেই আপস, এমন নাও হতে পারে। আর আপস যদি হল, তাহলে শিল্পের হানি হল—কিন্তু কাজ তো বন্ধ হল না। আর বাইরের চাপে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা, সেটা যে কোন শিল্পে প্রায় একইভাবে ঘটতে পারে। এটা জানা কথা। এ নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। আমি বলতে চাইছি দুটি সমস্যার কথা। যা একেবারে ষোল আনাই চলচ্চিত্রের সমস্যা এবং যার অস্তিত্ব বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি অনুভব করা যাচ্ছে। এর একটি কোন কোন বিশেষ ধরনের ছবির পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যটি কাজের মাঝখানে মাথা উঁচিয়ে হয় ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছে, আর না হয় কাজটাকে আপসের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

সকলেই জানেন যে, বাংলাদেশে থিয়েটারে আজকাল অনেক নতুন নাট্য সম্প্রদায় নতুন ধরনের নাটক পরিবেশন করছেন। আবার কিছু কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য গোষ্ঠীও নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন আঙ্গিক নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছেন, এবং রীতিমত সাহসের সঙ্গে তা মঞ্চস্থও করছেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে যেটা ঘটছে সেটা হল—এক ধরনের সাবেক অভিনয় রীতি প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যে অভিনয় রীতির কথা বলছি সেটার সূত্রপাত গিরিশ ঘোষের আমলে এবং পূর্ণবিকাশ শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ে। এটা যে একই ছাঁচে ঢালা কোন অভিনয়ের রীতি তা নয়। শিশির ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী—এঁরা সকলেই সমসাময়িক, একই আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ক্ষমতাবান মঞ্চশিল্পী হলেও, এঁদের প্রত্যেকেরই অভিনয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ফসলে তফাত হলেও, জমি এক : এর একটা প্রধান কারণ এই যে অভিনয় যে একটা আর্ট, এবং সেই আর্টের

কতকগুলি নিয়মের মধ্যে দিয়েই যে তার বিকাশ, একথা এঁরা জানতেন ও মানতেন। আজকালকার অভিনেতারা কোন নিয়ম মানেন না তা বলছি না। কিন্তু সেকালের সেরা অভিনয়ে একটা উপরি পাওয়া যেতো—সেটা হল, গত যুগের বাঙালীয়ানার একটা অথেণ্টিক চেহারা। এই অভিনয়ের ট্র্যাডিশন যদি বজায় থাকত, তাহলে এই বাঙালীয়ানার চেহারাটাও অভিনয়রীতির মধ্যে দিয়েই জিইয়ে রাখা সম্ভব হত। ট্র্যাডিশনটাই উবে যেতে বসেছে।

চিত্রপরিচালকের পক্ষে এ এক বিরাট ক্ষতি, কারণ এমন অনেক চরিত্রের কথাই ভাবা যায় যা ঠিক এই জাতের অভিনয় ছাড়া ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। স্বল্পপরিসর ভূমিকায়, যদি চেহারা ও গলার স্বর মোটামুটি মানানসই হয়, তাহলে আনকোরা নতুন লোক দিয়েও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু চরিত্র যদি হয় জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায়, বা দেবী-র কালীকিঙ্কর—তাহলে কি আর অ্যামেচার দিয়ে কাজ চলে? সেখানে ছবি বিশ্বাসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই।

ছবিবাবু চলে যাবার আগে বুঝতে পারিনি বাংলা ছবি কী বিপজ্জনকভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। আজ যদি কোন গল্প উপন্যাস পড়তে বসে কোন জাঁদরেল জমিদার চরিত্র বা এক ধরনের কেতাদুরস্ত ভারভার্তিক বাঙালী বা ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রের সামনে পড়ি, তাহলে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মনে মনে বলতে হয় যে এ চরিত্র ছবিতে মূর্ত করার উপযুক্ত কোন অভিনেতা আজ আর বাংলাদেশে নেই। সত্যি বলতে কি, এমন একজনও অভিনেতা নেই যাকে দিয়ে ইংরেজীতে যাকে বলে 'মনুমেন্টাল', এমন কোন চরিত্রের রূপ দেওয়ানো যেতে পারে।

তুলসী চক্রবর্তী চলে গিয়েও বাঙলা ছবিকে অন্য আরেকটি দিক দিয়ে কানা করে দিয়ে গেছেন। শুধু কমিক চেহারা থাকলেই ত আর কমেডিয়ান হওয়া যায় না। আকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের হাস্যরসবোধ বা কমিক সেন্স ও দুর্দান্ত অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তবেই তুলসী চক্রবর্তীর মত কমেডিয়ান হওয়া যায়। এখানে ভাঁড়ামোর স্থান নেই, যদিও দুর্ভাগ্যবশত এ কাজটাও তুলসীবাবুকে করতে হয়েছিল। একজন বহুগুণ সম্পন্ন অভিনেতার কেবল দর্শক-সমর্থিত একটি গুণ বেছে নিয়ে, তাকে সেই ছাঁচে ঢেলে তার পূর্ণ বিকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়ার অপকাজটা এদেশে মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে এত জনের ক্ষেত্রে হয়েছে যে তার ইয়ত্তা নেই। ভাঁড়ামিতেই হোক বা জাত কমেডিতেই হোক, ঠিক তুলসীবাবুর জায়গা নিতে পারে এমন আর কেউ বাংলাদেশে নেই। তাই সাহিত্যের অনেক কমিক চরিত্রের চিত্ররূপ আর সম্ভবই নয়। পথের পাঁচালিই কি আর আজকের দিনে সম্ভব? তা নয়—কারণ চুনিবালার মত অভিনেত্রীর আবির্ভাব তো আর দৈনন্দিন ঘটনা হতে পারে না।

এই তো গেল কাহিনী নির্বাচনের পথে বাধা। এছাড়া চিত্রনির্মাণের পথে (এবং সেই সঙ্গে কাহিনী নির্বাচনও) একটা বাধা কিছুদিন হল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যার অপসারণ কীভাবে হবে তা আমার জানা নেই।

সত্যজিৎ রায় সমসাময়িক শহুরে সমস্যা নিয়ে ছবি তোলেন না—এধরনের একটা মতবাদ বাজারে চালু হচ্ছে বলে কানে আসে। একথা সকলেই স্বীকার

করবেন যে নাগরিক জীবনের ছবি তুলতে গেলে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নগরের চেহারাটাকেও ছবিতে তুলে ধরতে হয়। অর্থাৎ, সে ছবির কাহিনীকে স্টুডিওর চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী করে রাখা চলে না, মাঝে মাঝে তাকে শহরের রাস্তা-ঘাটে নিয়ে ফেলতে হয়। নাটকে নেপথ্যে ঘটনার যে রীতি হাজার বছর ধরে লোক মেনে এসেছে, চলচ্চিত্র একেবারে প্রথম থেকেই সে রীতি বর্জন করেছে। তাছাড়া চলচ্চিত্রে—বিশেষ করে আধুনিক সমস্যামূলক কাহিনীতে—বাস্তবধর্মিতাই হল শিল্পের রীতি। সুতরাং স্টুডিওতে কৃত্রিম উপায়ে শহরের বাইরের চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ক্যামেরা নিয়ে রাস্তা-ঘাটে শুটিং করা ছাড়া কোন উপায় নেই। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে একটিবারও যিনি এ কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, তিনিই জানেন এটা কী দুরূহ কাজ।

আসলে ছবি তোলার কাজটা পরিচালক ও তাঁর কর্মিবৃন্দের কাছে একটা শিল্পকর্ম হলেও, যাঁরা বাইরে থেকে সে কাজটা দেখেন, তাঁদের কাছে সেটা একটা তামাশার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তার উপরে যদি সে তামাশায় কোন জনপ্রিয় অভিনেতা সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাহলে ত সোনায় সোহাগা। বিনি পয়সার Open-air Theatre দেখার লোভ সামলাবে কে? কাজেই শহর বা শহরতলির মাইল দশেকের মধ্যে যে কোন জায়গায় ক্যামেরা খাটালেই মুহূর্তের মধ্যে তাকে ঘিরে জনসমুদ্রের উদ্ভব হবে।

এই ভীড়ের লোক যে শুধু শুটিং দেখতেই আসে তা নয়। যে দৃশ্যটি তোলা হবে তাতে অংশ গ্রহণ করার বাসনাও এদের অনেকেই পোষণ করেন। এখানে অংশ গ্রহণ বলতে বোঝায় ক্যামেরায় এক বার মুখটি দেখানো। যাঁরা এটা করেন, তাঁরা অবশ্য এই ভেবেই করেন যে, সেমুখ তাঁরা আবার প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় দেখতে পাবেন। বারবার বলেও বোঝাতে পারিনি যে, এ সৌভাগ্য তাঁদের হতে পারে না। কারণ ছবির কোনো দৃশ্যেই অবান্তর কোন কিছুরই স্থান হতে পারে না।

বিদেশে যখন রাস্তাঘাটে শুটিং হয়, তখন কৌতূহলী জনতাকে কাজের গণ্ডির বাইরে রাখবার কাজে পুলিস সাহায্য করে। এদেশে পুলিসের ব্যবহারে যে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাটাই বেশি সেটা বলাই বাহুল্য। প্যারিসে নিউ-ওয়েভ পরিচালকদের দৌলতে বেশ কিছুদিন থেকেই শহরের যত্রতত্র শুটিং-এর রেওয়াজ চালু রয়েছে। সেখানে সাধারণ লোকে এতে এমনই অভ্যস্ত এবং হয়ত একাজে ভীড় করে ব্যাঘাত করলে কী জাতীয় ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে এত সচেতন যে ভীড় সেখানে জমেই না। Champs-Elysee-র মত রাস্তায় নির্বিঘ্নে শুটিং চলতে দেখেছি; আশেপাশে মাথা ঘুরিয়ে পুলিসের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি জনসাধারণের এ মনোভাব এদেশে স্বপ্নের বাইরে।

চিড়িয়াখানা ছবির জন্য শহর থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রামাঞ্চলে গোলাপ কলোনির 'সেট' তৈরি করে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করার কথা ভেবেছিলাম। যতদিন বাগান তৈরি হয়েছে, ঘর বসেছে, পাঁচিল উঠেছে, ততদিন কোন উৎপাত হয়নি। শুটিং আরম্ভ হবার পর দিন থেকে ট্রেনে করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কমপক্ষে হাজারখানেক লোক দুপুর নাগাদ কলোনীতে এসে পাঁচিল ও তার পিছনের আমগাছের ডালে চড়ে বসে তামাশা দেখা শুরু করেছে। সারা দুপুর রোদ মাথায় করে বসে থেকে, ছেলে-বুড়ো

মেয়ে-পুরুষ কিছু না করেও কাজের অপরিসীম ক্ষতি করেছে, তারপর বিকেলে রোদ পড়লে পর গাছ থেকে পাঁচিল থেকে নেমে আবার স্টেশনের দিকে ফিরে গেছে। কীভাবে কাজ হয়েছে তা আমরাই জানি, এবং এটাও জানি যে, যতদিন না বাংলাদেশের শহরের লোক ছবি-করিয়েদের সুখ-সুবিধার কথা একটু চিন্তা করবেন, এবং চিত্রনির্মাণের প্রচণ্ড অর্থ ও শ্রমব্যয়ের দিকটা উপলব্ধি করবেন, ততদিন—আর যাই হোক—আধুনিক নাগরিক জীবন নিয়ে সার্থক ছবি তোলা সম্ভব হবে না।

দেশ: ৩০-১২-১৯৬৭

পরিচালকের দৃষ্টিতে সমালোচক

["দেশ"-এর প্রশ্নমালার ভিত্তিতে]

পরিচালক ও সমালোচকের পরস্পর সম্বন্ধ সম্পর্কে আমি যা বলব, তা একান্তভাবে আমার নিজেরই কথা। সাধারণভাবে আমার বক্তব্যের কোন মূল্য আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালি ছবি মুক্তি লাভ করার আগে চিত্র-সমালোচকের কাছে পরিচালক হিসেবে আমার কোন পরিচিতি ছিল না। অর্থাৎ পথের পাঁচালি রচিত হয়েছিল সমালোচনানিরপেক্ষভাবেই। সমালোচনার প্রভাব যদি আমার রচনায় বিস্তৃত হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে পথের পাঁচালির পর থেকে। কিন্তু আজও যখন অধিকাংশ চিত্র-সমালোচকই বলে থাকেন যে, পথের পাঁচালিই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—তাহলে কি সমালোচনার প্রভাব আমার শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি ?

এ প্রশ্ন যাতে সমালোচকের মনে সংশয়ের উদ্রেক না করে, তাই আমি গোড়াতেই বলতে চাই যে, আমার মতে সমালোচনা আমার ছবির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি বলেই আমি মনে করি। এই দশ বছরে আমার শিল্পে যদি সত্যিই কোন উন্নতি না ঘটে থাকে, তার জন্য দায়ী আমি নিজেই।

কোন কোন অর্বাচীন পরিচালক বিচক্ষণ সমালোচকের ত্রুটি সংশোধনকারী মন্তব্য অনুধাবন করে নিশ্চয়ই লাভবান হতে পারেন। কিন্তু পরিচালক যদি সচেতন শিল্পী হন, তবে তাঁর রচনার দোষগুণ তাঁর নিজের কাছে অজানা থাকে না। দোষের জন্য নিন্দা এবং গুণের জন্য প্রশংসা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু সমালোচকের নিন্দা বা প্রশংসার পিছনে যদি যথার্থতার সিলমোহর না থাকে, তবে তা পরিচালকের বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া আর কোন কাজে আসে না। পরিচালক সমালোচকের কাছ থেকে তার রচনা সম্পর্কে কোন নতুন জ্ঞান আশা করেন না। যেটা তিনি আশা করেন, সেটা হল সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ধারণার সমর্থন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, পরিচালকের কাছে এ সমর্থনের মূল্য আছে কি ? আমার মতে এর মূল্য অনেক। আমি ছবি করব আমার নিজের ভঙ্গীতে, নিজের ভাবনা-চিন্তা অনুসরণ করে ; সমালোচক যদি রসবোধের বলে সে-ছবির স্বরূপটি

হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তবে যে তিনি একাধারে যোদ্ধা ও বন্ধুর কাজ করেন, সেটা অস্বীকার করি কী করে?

সমালোচক প্রকৃত সমঝদার হলেই ছবির গুণাগুণ বিশ্লেষণের অধিকারী হতে পারেন। সমঝদারী বলতে একেবারে চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে সম্পাদনার শেষ কাজটুকু পর্যন্ত চলচ্চিত্র রচনার প্রতিটি কাজের বিচার-ক্ষমতা বোঝায়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের যৌথ শিল্পের দিকটা সমালোচককে সব সময়ই মনে রাখতে হবে। পরিচালক সর্বেসর্বা হলেও ছবির সর্বপ্রকার গুণের জন্য ষোল আনা কৃতিত্ব তিনি কখনই দাবি করতে পারেন না। বরঞ্চ ত্রুটির জন্য তাকে অনেক বেশি পরিমাণে দায়ী করা চলে। অনেক সমালোচকের উক্তি থেকে এমনও মনে হয় যে, এই যৌথ শিল্পের দিকটা সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার কোন ধারণাই নেই। 'চিত্রনাট্য সুষ্ঠু' অথচ 'সংলাপ দুর্বল' বা 'পরিচালনায় মুন্সীয়ানা আছে' অথচ 'সম্পাদনার কাজ ত্রুটিপূর্ণ'—এ জাতীয় পরস্পরবিরোধী মন্তব্য সমালোচনায় মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। সংলাপ চিত্রনাট্যের অন্তর্ভুক্ত, আর সম্পাদনায় যদি ত্রুটি থাকে, তবে তার জন্য পরিচালককেও দায়িত্ব নিতে হয়।

ছবির কোন দোষ বা কোন গুণের জন্য কাকে কতখানি দায়ী করা চলতে পারে, তা জানেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা ছবিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সমালোচকের পক্ষে তাই নিন্দা-প্রশংসার ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারটা ভারী বিপজ্জনক। এবং পরিচালকের দৃষ্টিতে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। সমালোচক বলবেন, অমুকের অভিনয়ের সাবলীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিচালক কিন্তু জানেন যে, সে সাবলীলতার পিছনে রয়েছে তাঁরই দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, এবং প্রশংসার ষোল আনা না হোক, অন্তত বারো আনা তাঁরই প্রাপ্য।

উপন্যাস বা ছোট গল্পকে চিত্ররূপ দিতে হলে শিল্পের খাতিরে যে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তা বহুকাল থেকেই বিদেশে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের সমালোচক আজও এই পরিবর্তনের শিল্পগত প্রয়োজনটা মেনে নিতে পারেননি। অপু-কাহিনীত্রয় বা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের চিত্ররূপ দেওয়ার পর আমাকে তাই প্রতিবারই সমালোচকের বিস্তারিত তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে এবং প্রতিবারই মনে হয়েছে যে, চোখের সামনে চিত্ররূপ এবং হাতের কাছে মূল গল্পটি থাকার দরুণ দুই-এর বৈসাদৃশ্যের সহজ ফিরিস্তি দিয়ে সমালোচক তার মূল দায়িত্বটুকু সম্পূর্ণ এড়িয়ে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক আপাতসারগর্ভ কথার সাহায্যে কলাম ভরানোর কাজটি সেরে নিচ্ছেন।

আমার মতে, সমালোচক কাজের মত কাজ করেন তখনই যখন তিনি পরিচালক ও দর্শকের মাঝখানে একটি সেতু স্থাপন করতে সক্ষম হন। এটাই হল তাঁর প্রধান কর্তব্য। সমালোচককে সমঝদার হতেই হবে, কারণ সমালোচনাই তার জীবিকা। কিন্তু দর্শকদের সমঝদার হবার একমাত্র ব্যক্তিগত তাগিদ ছাড়া অন্য তাগিদ নেই। যেখানে ভালো ছবি সহজ ছবিও বটে, সেখানে সমালোচকের দায়িত্ব কম—কারণ দর্শক বিনা সাহায্যেই সে ভালোয় পৌঁছতে পারেন। কিন্তু এমন ভালো ছবিও হয়ে থাকে, যার রসের আস্বাদ একমাত্র প্রকৃত গুণগ্রাহীরই লভ্য। সেখানে সমালোচকের

এগিয়ে এসে শিক্ষকের ভূমিকাটিও গ্রহণ করতে হয়।

কোন সমালোচক যদি এমন ধারণা পোষণ করেন যে, ভালো মানেই হবে সহজ-ভালো অর্থাৎ সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ভালো, তাহলে আমি অন্তত তাকে বলব সমালোচকের ভূমিকা বর্জন করে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে। শিল্প সৃষ্টির তাগিদে সাধারণ দর্শকের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে চলার অধিকার সব পরিচালকেরই আছে। এই এগিয়ে চলার মানেই যে সৎশিল্পের পথে চলা, এমন নাও হতে পারে। সে-বিচারের দায়িত্ব সমালোচকের। সমালোচক পরিচালকের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে তার মূল সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবেন। আজকের দিনে যখন চলচ্চিত্র-রচনার রীতিনীতির এত দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, চারিদিকে যখন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছড়াছড়ি, তখন সমালোচককে সর্বদাই তার ইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হয়, নতুন ভাব নতুন ভঙ্গী নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হয়। কাহিনীর সংজ্ঞা পর্যন্ত আজকের দিনে বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের দৌলতে যন্ত্রপাতির বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে ; বিষয়বস্তুর পরিধি আজ এতই বিস্তৃত যে জয়েস-এর "ফিনিগানস্ ওয়েক"-ও আজ চিত্রে রূপায়িত। সমালোচকের তাই আজ দুরূহ দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। যেখানে পরিচালক নতুন পথে চলেছেন, সমালোচক সেখানে বিশেষভাবে তার সহায়তা করতে পারেন।

ছবি চলা-না-চলার ব্যাপারে সমালোচকের কোন হাত আছে কি ? এটার জবাব একমাত্র গ্যালাপ পোলেই পাওয়া সম্ভব। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। নিউ ইয়র্কে ছবির বাজারে সকলেরই বিশ্বাস যে, নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার চিত্র-সমালোচক বজলি ক্রাউদারের মতামতের উপর ছবির আয়ু একান্তভাবে নির্ভরশীল। পথের পাঁচালি যখন নিউ ইয়র্কে মুক্তিলাভ করল, তখন ক্রাউদার লিখলেন, এ ছবি পাশ্চাত্য সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। ছবির পরিবেশনের কাজে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রমাদ গুণলেন। এই পথের পাঁচালি ছবিই শেষ পর্যন্ত শত্রুর মুখে ভস্মপ্রদান করে নিউ ইয়র্ক শহরেই চলেছিল চৌত্রিশ সপ্তাহ! ক্রাউদার সাহেব বোধহয় এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করেই তার পরের বছর 'অপরাজিত' ছবির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অপরাজিত চলল মাত্র আট সপ্তাহ।

দেশ, শারদীয়, ১৯৬৫

pathagar.net
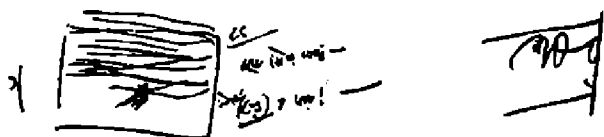
'অপুর সংসার' প্রসঙ্গে

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অপুর সংসার' ছবিটির সমালোচনার প্রথম ও শেষাংশে সমালোচক চিত্ররূপটির ভূয়সী প্রশংসা করে ("ভাবে, রসে ও আঙ্গিকে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে"—ইত্যাদি) মধ্যাংশে মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চিত্রনাট্যের বিবিধ দুর্বলতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। চিত্রনাট্যে অসঙ্গতি থাক বা না থাক, ছবিটি সম্পর্কে সমালোচক চন্দ্রশেখরের মতামতের যে অসংগতি এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, তা বিস্ময়কর।

সমালোচক বিভূতিভূষণ থেকে যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি "পথের পাঁচালি" বা "অপরাজিত" কোনটাই ভালভাবে পড়েননি অথবা তাঁর উদ্ধৃতি নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো : 'অপুর সংসারে'র চিত্রনাট্যকে খর্ব করা।

সমালোচক বলেছেন—'বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানসের সঙ্গে পরিচালকের কল্পনার গরমিল হয়ত এই ছবিতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' সাহিত্যিকের কল্পনা লিখিত ভাষায় ব্যক্ত ; পরিচালকের কল্পনা (উপন্যাসের উপর ভিত্তি হলেও) মূলত গতিশীল ছবির মাধ্যমে পরিস্ফুট। দুই-এ যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, সমালোচক কি সেটি বোঝেন না ? উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোন সার্থক চলচ্চিত্র রচিত হয়নি, যেখানে পরিচালককে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

অথচ সমালোচকের মতে 'প্রধান চরিত্র উপস্থাপনে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার আশ্রয় যেমনভাবে নিয়েছেন, তা চিত্রস্রষ্টার দৃষ্টিসিদ্ধির পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি।' আমার মতে ছবির অপু ও উপন্যাসের অপুর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। বরঞ্চ সমালোচকের মানসকল্পিত অপুর যে ইঙ্গিত আমরা পাই, তার সঙ্গে বিভূতিভূষণের অপুর বিশেষ মিল নেই। বিভূতিভূষণের অপুর সম্বন্ধে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—(১) অপুর চরিত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ করা যায়, এবং

(২) আর পাঁচজনের চেয়ে অপু অনেক বেশী অনুভূতিসম্পন্ন—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ দুই-ই তাকে সাধারণের চেয়ে বেশি বিচলিত করে। সমালোচকের মতে : 'অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুকে দেখানো হয়েছে শ্মশ্রুধারী বিরহীরূপে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর দয়িতার বিয়োগ-ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান জায়গায়। অপুর শোকাবেগ নিয়ে ছবিকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে—তার মধ্যে বিভূতিভূষণের অপুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।' অথচ অপর্ণার মৃত্যু দীর্ঘকালের জন্য অপুর সত্তাকে কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তার স্পষ্ট বিবরণ উপন্যাসে আছে। অপুর মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলেছেন—

'কি বিরাট শূন্যতা, কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে. . কখনও না, কাহারও দ্বারা না. . সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুল-ফল নাই, শুধু এক রুক্ষ, ধূসর, বালুকাময়, বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।' (মিত্রালয় সংস্করণ, ২৩০ পৃষ্ঠা)

অপর্ণার মৃত্যুর এক বছর পর অপু তার কলকাতার বাসা ছাড়বার কথা ভাবছে, কেন না, 'অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো—আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল' (২৩২ পৃঃ)। আবার 'কলিকাতা আর ভালো লাগে না, কিছুতেই না। একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনে গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সব দুঃখ দূর হইবে' (২৩৪ পৃঃ)। এর পরে চাঁপদানিতে শিক্ষকতা করার বর্ণনা আছে। এখানে অপর্ণার মৃত্যুর দুই বছর পরে প্রণব ও অপুর সাক্ষাৎকার হয়। বিভূতিভূষণ বলেছেন : 'তাহার (প্রণবের) মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যাহার মধ্যে একদিন উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, সে যেন প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল প্রবৃত্তি বা সন্তোষবোধ. . অপুর প্রকৃতিতে তো কখনও ছিল না' (২৩৬ পৃঃ)।

চিত্রনাট্যের প্রথম দিকে অপুর জীবনবাদিতা ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে অপর্ণার মৃত্যুর পরে তার তিক্ততা, রুক্ষতা ও cynicism-এর বৈপরীত্য ও তার নাটকীয়তা, বিভূতিভূষণের বর্ণনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

সমালোচকের আরেকটি বিচিত্র মন্তব্য : 'কাজলকে 'অলীক', 'অবাস্তব' ভেবে দূরে সরিয়ে রাখাটাও ছবিতে রসহানি ঘটিয়েছে।' মূল উপন্যাসটি কি সমালোচক আদৌ পড়েছেন ? উপন্যাসে অপর্ণার মৃত্যুর দুই বছর পর কাজল সম্বন্ধে অপুর মনোভাব এই—'ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুণ পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাধান করিয়াছে।' (২৪৫ পৃঃ)

এই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে অপু প্রথম কাজলের কাছে যায়—তাও মাত্র কয়েকদিনের জন্য। 'দেশ'-সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'অপু ও কাজলের মধুর সম্পর্কের যে উপাখ্যান মূল কাহিনীতে আছে, ছবিতে তার আভাস অল্প। কাজলের

পক্ষে তার শ্মশ্রুধারী বাবাকে চিনতে না পারার ফলেই দর্শকেরা বিভূতিভূষণের এই রস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' বিভূতিভূষণের বর্ণনা অনুযায়ী 'প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া ধরিল। অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল।'

কিন্তু উপন্যাসে এই প্রথম দেখাতেও অপুর মনে বাৎসল্য জাগেনি। অপু পুনরায় কাজলকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ পাড়ি দেয়। কাজলের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন প্রণব তাকে অসহায় অবস্থায় দেখে নিরুদ্দিষ্ট অপুর সম্বন্ধে মন্তব্য করে—'আচ্ছা পাষণ্ড ত ? মা-মরা কচি বাচ্ছাটাকে বেঘোরে ফেলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে ?. . দয়ামায়া নেই শরীরে ?' (২৮৮ পৃঃ)

এর তিন বছর পর অপু নাগপুর থেকে বাংলাদেশে ফেরে। প্রথমে যায় কলকাতায়—ছেলের কাছে নয়। কাজলকে দেখবার কোন তাগিদ তার মনে নেই—বরঞ্চ তার আগ্রহ লীলা সম্পর্কে (৩০০ পৃঃ)। এর বেশ কয়েক মাস পরে অপু কাজলের কাছে যায় ('কাজলের আগের চেহারা অপুর মনে ছিল না'—৩১৯ পৃঃ)! দ্বিতীয়বার কাজলকে দেখে অপুর মনোভাব বিভূতিভূষণ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন : 'আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবা মাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল—কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়াছিল ?' (৩২০ পৃঃ)

চিত্ররূপে কাজলের পাখি মারা সম্পর্কে সমালোচক যে-মন্তব্য করেছেন, তা-দ্বারা তিনি যুগপৎ সাধারণ জ্ঞানের অভাব ও মূল উপন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞানও আছে, তাঁরাই জানেন যে, নিষ্ঠুরতা একটি স্বাভাবিক শৈশব প্রবৃত্তি। বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক গল্পে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং তাঁর ডায়ারিতেও এর উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে পাখি মারার ঘটনাটি 'অপরাজিত' উপন্যাস থেকেই নেওয়া—যদিও উপন্যাসে ঘটনার নায়ক কাজল নয়—স্বয়ং পঞ্চবর্ষীয় অপু।

'দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে দিকি আমার হাতে। পরে সে নিজের হাতে পাখিটাকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আচ্ছা কেন মারতে গেলি তুই ? অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।' (৪৫ পৃঃ)

সমালোচক হয়ত বলবেন যে, এই ঘটনাটি অপুর চরিত্রের মাধুর্য নষ্ট করেছে। অপুর মনোবৃত্তি যে পিতৃমাতৃহীন কাজলের ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সে-কথা বোধহয় বলাই বাহুল্য, যদিও সমালোচকের মতে 'কাজলের এই স্যাডিজম্ (!) বা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অপু-অপর্ণার ছেলের সম্বন্ধে ভাবতে অবাক লাগে।'

আরেকটি কথা—বিভূতিভূষণের কাজল কেবলমাত্র 'কল্পনাপ্রবণ, ভীতু, প্রকৃতিপ্রিয়' নয়—বিভূতিভূষণের বর্ণনায় 'সে একদণ্ডও সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে' (৩১৩ পৃঃ)। দাদামশাই কাজলকে কড়া শাসনে রাখেন, প্রয়োজনে নির্দয় প্রহার করেন। (৩১৩ পৃঃ)

সমালোচক চিত্রনাট্যে কাজল-অপুর সম্পর্কে মাধুর্যের অভাব লক্ষ করেছেন।

চিত্রনাট্যের সমাপ্তি যে মধুর মিলনান্ত সুরে ঘটেছে, মূল উপন্যাসে কাজল-অপু সম্পর্কের সমাপ্তির সুর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। উপন্যাসের শেষে অপু কাজলকে রাণুর জিম্মায় রেখে দেশত্যাগী হয়। 'তুই এখানে থাক খোকা ; আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবিনে ? তোর পিসিমার কাছে থাকবি ?'—কাজল বলিল, 'হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বই কি ! আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা।' (৩৭৬ পৃঃ)। অপু কাজলের এ-অনুরোধ রক্ষা করেনি।

চিত্ররূপে পিতাপুত্রের মিলনের পর আবার এই বিচ্ছেদের অবস্থাটি (রাণু ও নিশ্চিন্দপুর সমেত) পর্যন্ত জের টানতে গেলে ছবির আয়তন কতখানি বৃদ্ধি পেত, তা প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত কিনা এবং তা শিল্পসম্মত হত কিনা, এ বিষয়ে সমালোচক কোন হদিস দিতে পারেন কি ?

আরো দু-একটি বিরুদ্ধ মন্তব্য, যা সমালোচক করেছেন, সে বিষয়ে কোন প্রতিবাদ বা মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না—কারণ যে-কোন ছবি সম্বন্ধে স্বাধীন মত (ভালো বা মন্দ) ব্যক্ত করার অধিকার সমালোচকমাত্রেরই আছে। তবে একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন—উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ কী হয়ে এসেছে, কী হওয়া উচিত বা কী হতে পারে, এ বিষয়ে সমালোচকের অধিকতর অনুশীলনের প্রয়োজন। উপন্যাসাবলম্বী সার্থক চলচ্চিত্রের উদাহরণের অভাব নেই। দেশজ শিল্পে যদি সমালোচকের আস্থা না থাকে, তবে যে কোন বিদেশী ক্লাসিক ছবি থেকে তিনি অনেক কিছু শিখতে পারেন।—ইতি

সত্যজিৎ রায়, ২৫-৫-৫৯

দেশ, ৩০-৫-১৯৫৯

pathagar.net

'চারুলতা' প্রসঙ্গে
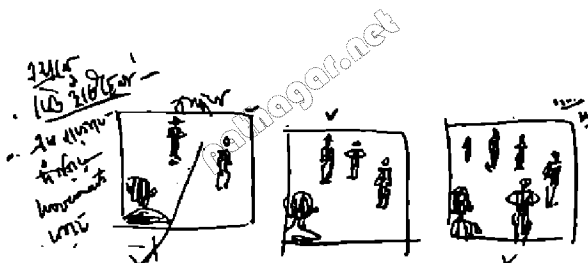
আশ্বিনের 'পরিচয়' খুলে দেখলুম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন। মুশকিল হয়েছে কি, সিনেমাটা একটা বারোয়ারি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো বই পড়া, ভালো ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়া, বা গানের আসরে বসে ভালো গান শোনা—এ সবের তাগিদ তাঁরাই বোধ করেন, যাঁরা ভালো ছবি, ভালো বই বা ভালো গানের কদর করেন, বা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিনেমার ব্যাপারে দেখি যাঁরা 'সংগম' দেখছেন, তাঁরাই আবার 'লা দোলচে ভিতা'তেও উঁকি দিচ্ছেন। এতে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই—কারণ পকেটে পাঁচসিকা পয়সা এবং হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় থাকলে যে-কেউ যে-কোন ছবিই দেখতে পারেন এবং তা নিয়ে মন্তব্য করতে পারেন। মন্তব্য যদি কফি হাউসে বা পাড়ার রকে নিবদ্ধ থাকে তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু সকলেই যদি পত্র-পত্রিকায় তাঁদের ভয়ংকরী বিদ্যার পরিচয় দিতে শুরু করেন তবে আশঙ্কা হয় যে যখন সবে বাংলা দেশের দর্শকের মধ্যে সিনেমার বিষয় জানবার ও শেখবার একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতারও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তখন এসব লেখা অন্তত কিছুসংখ্যক পাঠক তথা দর্শকের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে না কি?

রুদ্রমশাই সাহিত্য বোঝেন কিনা জানি না; সিনেমা তিনি একেবারেই বোঝেন না। শুধু বোঝেন না নয়, বোঝালেও বোঝেন না। যাকে বলে একেবারে বিয়ণ্ড রিডেম্পশন্। বিদেশে কিছু ভালো ছবি তিনি দেখেছেন, কিন্তু ভালো ছবি দেখলেই ভালো ছবি বোঝা যায়, বা ভালো ছবি নিয়ে লিখবার অধিকার জন্মায়, একথা তাঁকে কে বলল?

আসলে রুদ্রমশাই-র বাতিকই হল লেখা। চারুলতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'শ্রীসত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ও রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ে যেটুকু মিল আছে, তেমন মিল দুনিয়ার হাজার হাজার গল্পে আছে।' আমার বিশ্বাস চারুলতা ছবি চরিত্রের নাম ও ঘটনার সময়কাল পালটে আমার স্বরচিত চিত্রনাট্য বলে যদি বাজারে বেরুত, তবে রুদ্রমশাই তৎক্ষণাৎ তাঁর শতবার্ষিকী সংস্করণ রচনাবলী খুলে, হয়তো পরিচয়-এর জন্যেই, একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি-সংবলিত প্রবন্ধ লিখে আমায় Plagiarist প্রমাণ করে দিতেন।

শ্রীরুদ্র তাঁর লেখায় আমার তিনটি রবীন্দ্রভিত্তিক ছবির আলোচনা করেছেন। আমি কেবলমাত্র নষ্টনীড় নিয়েই কিছু বলব—কারণ আমার বিশ্বাস এই একটি উদাহরণ থেকেই সাহিত্যের গল্প থেকে ছবি করার সমস্যাগুলি পরিষ্কার হবে। বলা বাহুল্য, সব গল্পে সমান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। বিদেশী সাহিত্যে এমন অনেক ভালো গল্প আছে (চেকভ-মোপাসাঁয় এর নিদর্শন পাওয়া যাবে) যা প্রায় তৈরি চিত্রনাট্যের সামিল। নষ্টনীড় এ-শ্রেণীর গল্প নয়। কেন নয় তা আশা করি আমার এ-লেখাতেই প্রমাণ হবে। তাই রুদ্রমশাই যখন প্রশ্ন করেন—'এর আগাগোড়াই কি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্ক্রিপ্ট-এর অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অসুবিধা ছিল ?' তখন বোঝা যায় যে তাঁকে চিত্রনাট্যের অ আ ক খ শেখানোর প্রয়োজন আছে।

শ্রীরুদ্র নষ্টনীড়ের 'সুসংবদ্ধ ও সুসংহত' প্লটের কথা বলেছেন। আমার মতে নষ্টনীড়ে প্লট জিনিসটা গৌণ। যদি তা না হত তবে মূলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নষ্টনীড়ের 'গল্প' মুখে বলা সম্ভব হত। রুদ্রমশাই এ কাজটি একবার চেষ্টা করে দেখবেন কি ? নষ্টনীড়ের প্রধান সম্পদ হল এর চারটি প্রধান চরিত্রের মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ। এই সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলতে যেসব ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা থেকেই একটা কাহিনীর সূত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে বিশেষ ঘটনাটিকে আশ্রয় করে এ-কাহিনীকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা আকস্মিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য—কারণ উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার কোনো পূর্বাভাস গল্পের কোনো ঘটনায় বা সংলাপে রবীন্দ্রনাথ দেননি।

গল্পের গোড়া থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

ভূপতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল—দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশতঃ তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল।'

এই বর্ণনার মধ্যে যে মক্-সিরিয়াসনেসের সুরটি প্রকাশিত, গল্পের আগাগোড়াই এ-সুরের আভাস আছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ গল্পের জন্য এই বিশেষ সুরটি বেছে নিয়েছেন, কারণ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে এ-সুর ছাড়া এই বিশেষ চরিত্রসমষ্টি নিয়ে এই বিশেষ কাহিনীটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব হত না।

নষ্টনীড়ের প্রথম 'ঘটনা' হল উমাপদর প্ররোচনায় ভূপতির খবরের কাগজ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া। এই কাগজে লিপ্ত থাকার ফলে ভূপতি জানতে পারলেন না—'কখন তাঁহার বালিকা-বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল।' খবরের কাগজের গোড়াপত্তন দিয়ে যদি ছবি শুরু করতে হয় তাহলে চারুকে বালিকা অবস্থা থেকেই দেখাতে হয় এবং কিছু নতুন দৃশ্য রচনা করে—ভূপতির কাগজ নিয়ে মেতে থাকা এবং চারুর যৌবনে পদার্পণ দেখাতে হয়। এইসব নতুন দৃশ্য সম্পর্কে রুদ্রমশাই কী বলতেন জানি না, কিন্তু ছবির শুরু হিসাবে এ-পরিকল্পনা

যে দুর্বল তা বোধহয় তিনিও স্বীকার করতেন। তাই চারুর নিঃসঙ্গতার অবস্থা দিয়েই ছবি শুরু করা স্থির করেছিলাম।

এখানে একটা জরুরী প্রশ্ন ওঠে। অমল কি ভূপতির বাড়িতেই মানুষ? গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে অমলের প্রথম উল্লেখ পাই, তার আগেই রবীন্দ্রনাথ চারুর নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন। 'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ—অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল?' এই উক্তির কিছু পরেই আমরা জানতে পারি যে চারুলতা 'তাহাকে (অমলকে) ধরিয়া পড়া করিয়া লইত', এবং 'সামান্য একটু পড়াইয়া অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।'

অর্থাৎ—এ হল নিঃসঙ্গতার পরের অবস্থা, যেখানে চারু অমলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ভূপতি-সান্নিধ্যের অভাব কিছুটা মিটিয়ে নিচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছবি শুরু করতে গেলে অমলকে রাখা চলে না। অমল আসবে পরে এবং এই আসার মুহূর্তটির জন্য একটি নতুন দৃশ্যের প্রয়োজন হবে।

চারুর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সঙ্গে তার লেখাপড়া ও হাতের কাজের দিকে ঝোঁক, তার অন্তর্নিহিত ছেলেমানুষী (এদিকটা না দেখালে, পরে অমলের সঙ্গে মনের মিল দেখানো মুশকিল), কাগজ নিয়ে মেতে থাকার ফলে তার স্ত্রীর প্রতি ভূপতির ঔদাসীন্য এবং চারুর সেটাকে মেনে নেওয়া—এ সবকিছুই ব্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। এছাড়া উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ ও পিরিয়ডের একটা ইঙ্গিত দেওয়া।

কাহিনীতে এর পরের ঘটনা হল মন্দাকিনীর আগমন। মূল গল্পে এর প্রস্তুতি হচ্ছে এইভাবে—"যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি সচেতন হইয়া কহিল—তাই তো চারুর একজন সঙ্গিনী থাকা উচিত—ও বেচারার কিছু করিবার নাই।'

রবীন্দ্রনাথ যদি নষ্টনীড় গল্পটি চিত্রনাট্য হিসেবে রচনা করতেন, তাহলে এই 'কোনো আত্মীয়া' তাতে স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ। কারণ সিনেমায় এ-ধরনের অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই। অথচ কেবলমাত্র এই 'মনোযোগ আকর্ষণ' করার জন্য একটা নতুন চরিত্র রচনা করাও চলে না। তাহলে উপায় কি? এক ধরনের নাটুকে চলচ্চিত্রে মূলাশ্রয়ী একটি দৃশ্য কীভাবে রচিত হতে পারত তার একটা উদাহরণ দিই—

ভূপতি: (মুখে ভাতের গ্রাস পুরে): ওহো—আজ পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার কথা বললেন।

চারু: ও।

ভূপতি: কী বললেন জান?

চারু: কী?

ভূপতি: বললেন সেদিন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে উনি নাকি টের

পেয়েছেন যে তুমি বড় একা বোধ কর।

চারু : হতেই পারে না। আমি অমন কথা ওকে বলিই নি।

ভূপতি : না-বলা সত্ত্বেও বুঝেছেন......

চারু : থাক ওসব কথা। আর দুখানা লুচি দেবো ?

ভূপতি : অথচ আমি বুঝিনি ? কী আশ্চর্য ! কী অন্যায় ! সত্যি, এ-অপরাধের ক্ষমা নেই।

চারু : তুমি খাবে, না আবোলতাবোল বকবে ?

ভূপতি : উমাকে বলব—মন্দাকে আনিয়ে নিতে।

আমার কাছে, কোনো এক অবসর মুহূর্তে ভূপতির পক্ষে চারুর এই নিঃসঙ্গতার ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলা অসম্ভব বলে মনে হয়নি। চারু যতই তার অন্তরের ভাব গোপন করে রাখুক না কেন, তারও তো একটা সীমা আছে। আর ভূপতির মতো খেয়ালশূন্য ব্যক্তিও তো হাজার হোক মানুষ ; এবং স্ত্রীর প্রতি বিরূপতার কোনো ইঙ্গিতও মূলের ভূপতির চরিত্রে নেই।

ছবির প্রথম দৃশ্যের দুপুর এবং দ্বিতীয় দৃশ্যের রাত মিলে চারু-ভূপতির জীবনের একটি টিপিক্যাল দিন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। মূল কাহিনীতে অনেক দিন এবং অনেক রাতের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর অজস্র বিবরণ আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী জড়িয়ে কোনো একটি গোটা দৃশ্য নেই। গল্পের পাঠক এ-অভাব সম্পর্কে সচেতন না হলেও, ছবিতে যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল—সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয়, এবং একটা সময়ের সূত্র ধরে কাহিনীর সূত্র এগোতে থাকে, সেখানে এ-ধরনের অন্তত একটি দৃশ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজের চাপে যে-ব্যক্তি দিনের বেলা তার স্ত্রীকে অবহেলা করে, কাজের অবসরে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার কি রকম, এটা জানবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দর্শকদের হতে বাধ্য। এইসব কারণেই ছবিতে এই প্রথম নৈশ দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল।

এই নৈশ দৃশ্যের প্রথম অংশে ভূপতিকে দেখি ভোজনরত অবস্থায়। চারু তার সামনে বসে, হাতে হাতপাখা। ভূপতি উমাপদকে তার কাগজের ম্যানেজার হিসেবে বহাল করার সংকল্পের কথা চারুকে বলে। মূল গল্পে আমরা মাত্র তিনবার উমাপদর উল্লেখ পাই। প্রথম—'শ্যালক উমাপদ ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল—'ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির কর। তোমার যেরকম অসাধারণ—ইত্যাদি।'

দ্বিতীয়—'উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে, তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।'

প্রথম উল্লেখে বুঝি উমাপদ ওকালতিতে ব্যর্থ—কিন্তু এতে তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ মনে জাগে না।

দ্বিতীয় উল্লেখে সামান্য ইঙ্গিত আছে যে উমাপদ-ভূপতির মধ্যে কাগজের পলিসি নিয়ে একটা মতভেদ চলছে, কিন্তু এও তেমন কিছু নয়।

অথচ তৃতীয় উল্লেখেই দেখি উমাপদ ভূপতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

সিনেমার অন্য চারটি চরিত্রের মতোই উমাপদও একটি কংক্রীট চেহারা নিতে বাধ্য। সেখানে তার আচরণে, অথবা তার সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্রের আলোচনায় যদি কোনোরকম দুর্বলতার ইঙ্গিত না পাওয়া যায় তবে তার বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হবে কি ভাবে ? আর ভূপতি উমাপদর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে এমন ইঙ্গিত ঘটনায় বা সংলাপে না থাকলে এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শকের মন স্পর্শ করবে কেন ?

এইসব বিবেচনা করেই স্থির করা হয়েছিল যে ভূপতি উমাপদর চারিত্রিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও, চারুর ভাই হিসেবে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, কতকটা যেন তার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তাকে নিজের কাগজটির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে বহাল করতে মনস্থ করে। চারুর দিক থেকেও একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ('দাদা পারবে ? ওর তো কোনো কাজেই মন বসে না !') যে উমাপদ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। মূল গল্পে চারু-উমাপদর পরস্পরের মনোভাবের কোনো ইঙ্গিত নেই। মন্দা বা অমলের সংলাপেও উমাপদর কোনো উল্লেখ নেই। অথচ যে চরিত্র কাহিনীতে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, ছবিতে তাকে এতটা অস্পষ্ট, এতটা আড়ালে রাখা চলে না।

ভোজনের পরের দৃশ্যে রাত আরো গভীর। ভূপতি সম্পাদকীয় রচনায় ব্যস্ত। চারু এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়ায়। তার হাতে ভূপতির জন্য নক্শা-করা রুমাল। ভূপতি চারুকে দেখে।

ভূপতি : আর দু-মিনিট, চারু।
চারু : তাড়া দিতে আসিনি।

কাহিনীর এই ভূমিকা-পর্বে চারুর দিক থেকে অভিমান প্রকাশ করা চলে না। যদি তা সম্ভব হত তাহলে নষ্টনীড় গল্প অন্য চেহারা নিত। চারু এগিয়ে এসে রুমালটা ভূপতিকে দেয়।

ভূপতি : এটা তুমি করেছ ?
চারু : এবার তোমার একটা চটিতে নক্শা করে দেবো।
ভূপতি : এত সময় তুমি কখন পাও চারু ?
চারু : আমার কি সময়ের অভাব আছে ?

boighar.net

নিঃসঙ্গতার এই ইঙ্গিতটুকু দিয়ে চারু পাশের ঘরে চলে যায়। সে চায় না ভূপতির সঙ্গে এই নিয়ে একটা মান-অভিমানের পালা শুরু হোক। ইঙ্গিত ভূপতি লক্ষ করবে এমন আশাও হয়তো চারুর নেই।

কিন্তু ইঙ্গিত ভূপতির লক্ষ এড়ায় না। রুমাল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে—তোমার বড় একা লাগে, না চারু ?'

'ও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'নিঃসঙ্গতার অভ্যাস তো কোনো কাজের অভ্যাস নয়, চারু ?'

'তুমি স্বর্ণলতা পড়েছ ?'

চারু ঠিক এই মুহূর্তে এই অবান্তর প্রশ্নটি করে তার স্বামী তার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে কতটা সচেতন হয়েছে কিনা সেটা পরখ করে দেখছে। এই একটি অবান্তর প্রশ্নেই যদি প্রসঙ্গ চাপা পড়ে তাহলে চারুর কোনো আশাই নেই। এই ধরনের পরীক্ষা চারুর মতো চাপা অথচ sensitive চরিত্রের পক্ষে সংগত বলেই আমার মনে হয়েছিল।

ভূপতি চারুর কথা স্পষ্ট শুনতে পায়নি।

ভূপতি : কী ?

চারু : স্বর্ণলতা।

ভূপতি অট্টহাস্য করে ওঠে।

চারু : হাসছ কেন ?

ভূপতি চারুর কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে।

ভূপতি : আমার চারুলতা আছে। নাটক নভেল কাব্য—কিচ্ছু চাই না আমার। বুঝেছ ?

ভূপতি চারুর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায়। এইখানে ভূপতির শেষ কথা শোনা যায়।

ভূপতি : এক কাজ করব—তোমার দাদাকে বলব তোমার বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। তাহলে আর তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না। কেমন ?

এইখানেই ছবির প্রথম পর্বের শেষ।

ছবির দ্বিতীয় পর্বের শুরু আরেকটা দুপুর দিয়ে। মন্দা চারুর খাটে শুয়ে চারুর সঙ্গে গাধাপেটাপিটি খেলছে। অন্য ক'টি চরিত্রের মতোই মন্দার চরিত্র সম্পর্কেও কাহিনীতে ইতস্তত মন্তব্য ছড়ানো রয়েছে। মন্দা 'মূঢ়', 'মন্দার আর যা কিছু গুণ থাক, কল্পনা ছিল না'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, মন্দাকে প্রায় চারুর বিপরীত চরিত্র হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন। তাই চারুর উপযুক্ত সঙ্গী হওয়া বা চারুর হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করা মন্দার সাধ্যাতীত। চারুকে দেখি সে খেলতে বসে হাই তোলে, মন্দার রসিকতা ও গুরুগম্ভীর মন্তব্যে সে ধমক দেয়, বা নিরুত্তর থাকে।

মূল গল্পে মন্দার সঙ্গে চারুর যে ক'টি ঘটনার বর্ণনা আছে সবই অমলকে জড়িয়ে। অথচ ভূপতির প্ল্যানের ব্যর্থতা ফুটিয়ে তুলতে হলে অমল আসার আগে চারু-মন্দার এই দৃশ্যটির একান্ত প্রয়োজন। ছবিতে অমলের আগমন এই তাস খেলার দৃশ্যের অব্যবহিত পরেই—এই একই দুপুরে। এই দৃশ্যের কোনো উপাদানই মূল গল্পে নেই, সুতরাং এখানে পরিচালকের নিজস্ব কল্পনার উপরেই নির্ভর করতে হয়।

ইকনমির খাতিরে অমল-চারুর সম্পর্কটি যত শীঘ্র যত কম কথায় ব্যক্ত করা যায় তার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। অমল ঝড়ের মধ্যে এসে হাতের ছাতাটি বগলে পুরে বৌদিকে প্রণাম করে। তার প্রথম কথা—বৌঠান, আনন্দমঠ পড়েছ, আনন্দমঠ ?'

চারুর বঙ্কিম-প্রীতির ইঙ্গিত ছবির শুরুতেই আছে। সুতরাং অমলের এই উক্তিতে

পরস্পরের মনের মিলের ইঙ্গিত আছে।

অমল প্রণাম সেরেই ছোটে দাদার সঙ্গে দেখা করতে। চারুর দিক থেকেও অমলের আগমনে অতিরিক্ত খুশির কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। পরস্পরের দেখা হওয়ার যে খুশি ভাব, সেটা প্রকৃতির প্রগল্‌ভতার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে আর বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারেনি।

ভূপতি-অমল সাক্ষাৎকারের কোনো দৃশ্য মূল গল্পে নেই—তাই এখানেও কল্পনার আশ্রয়, এবং এখানেও সেই ইকনমির প্রশ্ন। প্রণাম সেরেই অমল ভূপতির চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়, অর্থাৎ দাদার প্রপার্টিতে তার যেন স্বাভাবিক অধিকার।

ভূপতি : পিসিমা কেমন ?

অমল : আর বোলো না—মার জন্যই তো দেরি। কিছুতেই আসতে দেবেন না।

অমল যে ভূপতির পিসতুতো ভাই—এটাও তো জানানো দরকার! সিনেমায় সংলাপের আশ্রয় ছাড়া রুদ্রমশাইর আর কোনো পন্থা জানা আছে কি ?

ভূপতি শাসায়—অমলকে তার কাগজের প্রুফ দেখে দিতে হবে। (মূল গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ-খবর আছে)। ভূপতি অমলকে তার প্রেস দেখায়। Sentinel কাগজ ছাপা হচ্ছে (কাগজের নাম একটা নিশ্চয়ই ছিল, যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো নামের উল্লেখ করেননি)। ভূপতি গভর্ণমেন্টের সীমান্তনীতি নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে। অমল ত্রাসের ভান করে—'তুমি সরকারের উপর কটাক্ষ করেছ ?' (সীমান্তনীতি নিয়ে সম্পাদকীয়র উল্লেখ মূলে প্রথম পরিচ্ছেদে আছে)। অমল রাজনীতি সম্পর্কে হালকা মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, কারণ এ বিষয়ে তার উৎসাহ নেই।

অমলের প্রস্থানের পর ভূপতি-উমাপদ কাগজ নিয়ে আলোচনা করে। কাগজের পলিসি নিয়ে দুজনের মতবিরোধের ইঙ্গিত মূলে থাকলেও, তা নিয়ে সংলাপ সংবলিত কোনো পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য নেই। আমার মনে হয় এই ধরনের একটি দৃশ্য ছাড়া নষ্টনীড়ের চিত্রনাট্য হতে পারে না, কারণ আগেই বলেছি—উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বাসযোগ্য না করতে পারলে কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতিও ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া উমাপদ যে 'ভূপতির কাগজখানির কার্যাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া সমস্তই উমাপদর উপর ছিল' (নবম পরিচ্ছেদ)—এ খবরও দেওয়া দরকার। মূলে এ খবর লেখক প্রকাশ করেছেন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটির সঙ্গে। সিনেমায় এ-রীতি অচল। অথচ খবরটি অত্যন্ত জরুরি; এবং অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, জোরের সঙ্গে বলা দরকার। এজন্যই উমাপদর হাতে ভূপতির চাবি তুলে দেওয়ার দৃশ্যটি উদ্ভব করার প্রয়োজন হয়েছিল।

এই দুপুরের দৃশ্যের তৃতীয় অংশে অমলের ঘরে অমল চারু ও মন্দাকে দেখিয়ে পাঁচটি মূল চরিত্র যে পেন্টাগন্যাল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গল্পকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অমলের ঘরের এই দৃশ্যে চারু-অমলের বৌঠান-দেবর সম্পর্কের মধুরতা ছাড়া আর কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। অমল বাক্স থেকে জিনিসপত্র বার করতে করতে কথা বলে, চারু বালিশে ওয়াড় পরায়। শ্রীরুদ্র যদি এ-দৃশ্যটি মনোযোগ দিয়ে দেখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে চারু 'আগাগোড়াই অমলের দিকে দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে যায়'—এমন ভুল মন্তব্য করতেন না।

এই দৃশ্যের শেষে চারু অমলের হাত থেকে ছেঁড়া সার্ট ছিনিয়ে নিয়ে যায় রিপু করার জন্য। এটাকে চারুর একটা স্বাভাবিক অভিভাবকী মনোভাব ছাড়া আর কিছু মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

এই দৃশ্যের পরের নৈশ দৃশ্যটি দিয়ে ছবির exposition পর্বের শেষ। এ-দৃশ্যে অমলকে ভূপতির সঙ্গেই দেখি—চারুর সঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূপতির মুখ দিয়ে অমলকে যে কথাটা বলিয়েছেন সেটা এখানে মনে করা দরকার। —'অমল, আমাকে এই কাগজের হ্যাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড় একলা পড়েছে।......তুমি অমল—ওকে একটু পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়।.....চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।'

অর্থাৎ চারু-অমলের সখ্যের ব্যাপারে যে ভূপতি এজেন্টের কাজ করে এটা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। চিত্রনাট্যকার irony-র এই সুবর্ণ সুযোগটি অবশ্যই নেবে।

মূল গল্পে কিন্তু ভূপতির এই অনুরোধের আগেই চারু অমলকে 'ধরিয়ে পড়া করাইয়া' নেয় (প্রথম পরিচ্ছেদ)। অথচ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভূপতির অনুরোধে অমল সে কথা প্রকাশ করে না। সে বিষয় কোনো উল্লেখ না করেই অমল বলে, 'বৌঠান যদি পড়াশুনা করেন তাহলে আমার বিশ্বাস উনি বেশ ভালোই শিখতে পারবেন।' ছবিতে ভূপতির অনুরোধে অমল যে উল্লসিত এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি—যেমন মূল গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেও হয়নি ; আগ্রহ ও আনন্দটা প্রধানত চারুরই—অমলের ততটা নয়। ছবিতে ভূপতির অনুরোধে অমলকে দিয়ে তাই বলানো হয়েছিল—'দাদা, আমি নিজে সাহিত্যচর্চা করব, না তোমার বৌকে করাব ?'

এর পরেই development পর্বের শুরু। এখানে বলা দরকার যে ছবির আঙ্গিক কেমন দাঁড়াবে তার আভাস আদি-পর্বেই দেওয়া হয়েছে। মূল কাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা ও সংলাপের পরিবর্তে চিত্রনাট্য রচনার চিরাচরিত পদ্ধতিতে গোটা গোটা দৃশ্য মারফৎ এ-কাহিনী বিবৃত হবে। এর কারণ খামখেয়াল নয় ; আদিপর্বে বাধ্য হয়েই যে এ-রীতি অবলম্বন করতে হয়েছে তা আগেই দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্রে নিজস্ব রীতি অনুসরণ করে যে-আদিপর্ব রচিত হয়েছে, ছবির অবশিষ্ট অংশে যদি সে-রীতি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে চারুলতা আর যাই হোক না কেন, শিল্প হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মূলের হুবহু অনুসরণ কেন অসম্ভব তার আরো কিছু কারণ এখানে দেখানো দরকার।

মূল গল্পে এমন অনেক কিছুরই বর্ণনা আছে যা 'প্রতিদিন' ঘটে, বা 'মাঝে মাঝে' 'সময় সময়' বা 'এক এক দিন' ঘটে। যেমন—'তাহা লইয়া চারুলতা মাঝে মাঝে

কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ করিত', '(অমল) প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় ও আবদার করে', 'অমল মাঝে মাঝে সাহিত্যসভায় প্রবন্ধ পাঠ করে।' চলচ্চিত্র সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও বোঝা যায়, এই 'মাঝে মাঝে'-র ঘটনাগুলি অনেক সময়ই ছবির 'মাঝে মাঝে' দেখানো চলে না।

এছাড়া এমন কিছু ঘটনাও মূল গল্পে আছে যার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে একটা দীর্ঘ সময়কাল ও বিস্তৃত development-এর ইঙ্গিত আছে। যেমন চারু আশা করে যে, অমলের রচনা তাদের দুজনের বাইরে আর কেউ পড়বে না। অমল কিন্তু তার রচনা ছাপানোর লোভ সংবরণ করতে পারে না। সরোরুহ পত্রিকায় সে লেখা পাঠায়, সে-লেখা ছাপা হয় এবং সে নিজেই গর্ব করে চারুকে সেকথা বলে। তারপর দেখি—'অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসা পাইল। মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বৌঠানকে দেখাইত :......অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নাম স্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না।......ভূপতি একদিন অবসরকালে চারুকে কহিল, 'তাই ত, আমাদের অমল এমন ভালো লিখতে পারে তা তো জানতুম না!'

এই সমগ্র ঘটনাবলীকে যদি ছবিতে দৃশ্য ও সংলাপের সাহায্যে স্থান দিতে হয় তাহলে কাহিনীর ভারসাম্য রক্ষা হয় কী ভাবে সেকথা রুদ্রমশাই ভেবে দেখবেন কি ? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে মূলের অনুসরণ করতে হলেও চিত্রনাট্যকারকে নতুন সংলাপ ও দৃশ্যের উদ্ভব করতে হত, এবং তাতেও নিশ্চয়ই রুদ্রমশাই আপত্তি তুলতেন।

আসলে সিনেমার আঙ্গিকের খাতিরে এইসব অবশ্য পরিবর্তন ও পরিবর্জনের ফলে যা দাঁড়াল তার সঙ্গে মূলের মিল বা বেমিল কতখানি সেটাই বিবেচ্য। থীম, প্লট, চরিত্র সবই কি পালটে একেবারে একটি আস্ত নতুন কাহিনী রচিত হল যার সঙ্গে নষ্টনীড়ের মিল আর হাজারটা গল্পের মতোই ? এ প্রশ্নের জবাব আমার এই আলোচনার শেষে আপনিই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি।

Development পর্ব অথবা মধ্যপর্বের শুরু আরেকটি দুপুর দিয়ে। ছবির প্রথম দুপুরে চারু একা, দ্বিতীয়তে চারু ও মন্দা, তৃতীয়তে চারু, মন্দা ও অমল। একই ঘর, একই খাট, একই পরিবেশ, একই ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ। এই দৃশ্যের ঘটনার সারাংশ হল এই—চারু কাজ করছে, মন্দা অকাজ করছে, অমল দাদার আদেশ অনুযায়ী বইখাতা হাতে বৌঠানের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করতে এসেছে। অমলের অনুরোধে মন্দা পান সেজে আনে। অমল মন্দার গোলাম-চোর খেলার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের প্রসঙ্গ তোলে। চারু আলোচনায় তর্কবিতর্কে মেতে ওঠে, মন্দা ঘুমিয়ে পড়ে। মন্দার নাসিকাগর্জনে ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে চারু-অমল মাদুর নিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়। যাবার সময় চারু হাত থেকে যে-জিনিসটা নামিয়ে রেখে যায় সেটা হল ভূপতির জন্য অর্ধসমাপ্ত চটির নকশা। এর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চারু তার কাজ থামায়নি। রুদ্রমশাই-এর 'চারুর দীপ্ত চক্ষে অমলের দিকে চাওয়া' এ দৃশ্যেও নেই, কারণ ভূপতির প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করে অমলের সান্নিধ্য ভোগের সময় এখনো

আসেনি।

মূল কাহিনীতে এই তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনা হিসেবে কোনো একটি গোটা দৃশ্য নেই। এই বিশেষ দৃশ্যে ব্যবহার্য কোনো তৈরি সংলাপও নেই। ছবির এ-দৃশ্য ঠিক এইভাবে তাই মূল গল্পে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাও জোর গলায় বলব যে এ দৃশ্যে এমন কিছুর অবতারণা করা হয়নি যা থেকে মনে হতে পারে যে মূলের এই বিশেষ ত্রিকোণ সম্পর্কটির কোনো বিকৃতি ঘটেছে। যা কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করা হয়েছে তা compression-এর খাতিরে।

বাগানের দৃশ্য সম্পর্কে শ্রীরুদ্র বলেছেন, 'বাগান করা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে অমল ও চারুর যে সখ্য সম্পর্কের প্রকাশ পাইত তা চিত্রে পাই না, কারণ এই প্রাথমিক সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের থীমে আছে সত্যজিৎ রায়ের থীমে নেই।' আশ্চর্য! নষ্টনীড় গল্পে বাগানের উল্লেখের আগেই আমরা চারু-অমলের সখ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই চারুর পড়া করিয়ে নেবার বর্ণনা থেকে, অমলের নানান আবদারের বিবরণ থেকে, অমলের জন্য পশমের চটিতে নকশা করার ঘটনা থেকে। কিন্তু চারুলতা ছবিতে অমল ও চারুকে প্রথম একা দেখা যায় বাগানে, এবং এখানেই দেখি তারা প্রথম প্রাণ খুলে কথা বলে।

ছবিতে বাগানে তিনটি বিভিন্ন দিনের ঘটনা পর পর বলা হয়েছে। প্রথমটিতে চারু-অমলের বন্ধুত্বের সূত্রপাত, দ্বিতীয়টিতে চারু এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে অমলের কাছে আবদার পেশ করছে ('যা লিখবে, এই খাতাতেই থাকবে—ছাপাতে পারবে না কিন্তু!'), তৃতীয়টিতে চারুর মনে প্রথম অভিমানের ইঙ্গিত। ভূপতি এ-পর্বে অনুপস্থিত। মন্দা আছে—দর্শক হিসেবে—যেমন মূল কাহিনীতেও আছে ('আমার জন্য একটা পাকা আমড়া আনবি?')।

মূল গল্পে চারু-অমল-মন্দাকে জড়িয়ে যে দ্বন্দ্ব তার সারাংশ হল এই—'একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্ন চক্ষে দেখে না', তাই মন্দা প্রথমে অমলকে বিশেষ আমল দেয় না। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে নাম কেনার পর 'মন্দা যখন দেখিল যে অমল চারিদিক হইতে শ্রদ্ধা পাইতেছে—তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে ভাবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল—সে যেন অমলকে নতুন করিয়া দেখিল!' (প্রসঙ্গত এ-বর্ণনায় পাঠক যদি মনে করেন যে মন্দাও স্বামীসান্নিধ্যে বঞ্চিত হয়ে চারুর মতোই অমলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না)।'এর ফলে মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল।' কারণ, মন্দা সাহিত্যে উৎসাহের ভাণ করতে শুরু করে, এবং অমল চারুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা না করে মন্দাকে সঙ্গ দিতে শুরু করে। এতে চারু স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়। মন্দার তুলনায় সে যে কত বেশি বুদ্ধিমতী সেটা অমলকে প্রমাণ করার জন্য সে লিখতে শুরু করে। অনেক চেষ্টার পর অমলের প্রভাব কাটিয়ে সে যখন নিজস্ব ভাব-ভঙ্গিতে লিখতে সক্ষম হয় তখন তার লেখা সাহিত্যগুণে অমলের লেখাকে অতিক্রম করে। (অমলের রচনার শিরোনামা, বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু চারুর লেখা 'খানিকটা অগ্রসর হইতেই.....সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা,

ভঙ্গি ও আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।' অমলের মতে কিন্তু 'এ-লেখার গোড়ার দিকটা বেশ সরেস হইয়াছিল, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।') যাই হোক চারুর অভিমান ভাঙার উদ্দেশ্যে এ-লেখা জোর করে কাগজে ছাপায়। ছাপানোর পর কোনো এক সমালোচক অমলের লেখার চেয়ে চারুর লেখার অনেক বেশি প্রশংসা করে। চারু প্রথমে এ-প্রশংসায় খুশি হয়—কিন্তু অমল আঘাত পাবে মনে করে তার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। চারুর হাতে সমালোচনা দেখে অমলের উল্টো ধারণা হয়—'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' অমল চলে যায় মন্দার কাছে। এতে চারুর অভিমান দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে ভূপতির কাছে মন্দা সম্বন্ধে অভিযোগ জানায়—'কিছু দিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার আর ভালো লাগছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না'।

এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অমলের চরিত্রের যে-রূপটি আমরা দেখতে পাই, তা একাধারে অপরিণত, অস্থির বা vacillating ও দুর্বল। মন্দাকে তাড়াবার অনুরোধে চারু-চরিত্রও বেশ খর্ব ও স্থূল হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। সাহিত্যের কাহিনীকারের স্বাভাবিক সুযোগগুলি গ্রহণ করে ভাষার প্রসাদগুণে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাবলীর মধ্যেও যে suspension of disbelief সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তা চলচ্চিত্রকারের সাধ্যের অতীত। চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষতাই এই ঘটনাবলীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত—ফলে অমল-চারুর মান-অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা ন্যাকামির সামিল হয়ে দাঁড়াত। কারণ, দর্শকের মনে সদাই প্রশ্ন জাগত---বোঝাপড়ার সুযোগের অভাব যেখানে নেই, সেখানে এমন করে রাগ পুষে রাখা কেন ?

অথচ এটাও অস্বীকার করা চলে না যে কাহিনীর প্রথমাংশে এই ছেলেমানুষী মান-অভিমানের পালা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পরিসমাপ্তির অমোঘ ট্র্যাজিডি যেন এই ছেলেমানুষীর পটভূমিকায় খোলে ভালো। এই দিকটা মনে রেখে এবং তার সঙ্গে আধুনিক চিন্তামনোভাবসম্পন্ন দর্শকের প্রতিক্রিয়ার কথাও মনে রেখে, কাহিনীর এই অংশের ঘটনাবলীতে কিছু রদবদল করা হয়েছিল।

কতকটা দাদার প্ররোচনাতেই যে অমল চারুকে সঙ্গ দিচ্ছে, এটা যদি চারু জেনে ফেলে, তবে তার পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই আমার মনে হয়েছিল। চারুর অভিমানের শুরু ছবিতে এইভাবেই। অমলও এই অভিমানের সুযোগ নিয়ে চারুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে তার কাছ থেকে কাগজে লেখা পাঠানোর অনুমতি আদায় করে নিচ্ছে। মূলে চারুর অভিমানের মাত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অমলের insensitivity-র অনেক উদাহরণ আছে।

বাগান থেকে উপরে এসে চারুকে তার ঘরে না পেয়ে অমল মন্দার কাছে যায়। খেলাচ্ছলে তাকে জিগ্যেস করে, 'বল তো কোন্ কাগজে লেখা পাঠাই ?' অমল জানে মন্দার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে অস্বস্তিকর মান-অভিমানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অমল-মন্দার শেষ কথাগুলি চারু শুনতে পায়। অমল তখন উঠে চলে যাচ্ছে।

চারু নন্দাকে সামান্য অজুহাতে ধমক দেয়।

নাটকের দিক থেকে এবার যেটার প্রয়োজন সেটা হল ভূপতিকে এই cross-current-এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা। মূলে দেখি চারু-অমলের সান্নিধ্যের এজেন্ট হয়েও তাদের মান-অভিমানের প্রকৃত রূপটি তাকে বার বার এড়িয়ে যাচ্ছে। এইটে ফুটিয়ে তোলাও যেমন দরকার, আবার চারুর মানভঞ্জনেরও দরকার। এই দুইটি একত্রে করার পক্ষে অমলের বিয়ের সম্বন্ধের দৃশ্যটি সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছিল।

মূল গল্পে এ-ঘটনা ঘটছে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর। চারু-ভূপতির কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন—

ভূপতি : আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না ?

চারু : আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না—আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি : তোমার কি মনে হয় সে করবে না ?

চারু : আগে তো অনেকবার চেষ্টা করে দেখা গেছে, কোনো মতে তো রাজী হয়নি !

ভূপতি : কিন্তু এবারের প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি সেভাবে আশ্রয় দিতে পারব না।

'ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।'

এখানে লক্ষণীয় এই যে ভূপতি কতকটা নিজের ভার হালকা করার জন্যই অমলের বিয়ে দিতে চাইছে। মূল গল্পে অমল ভূপতির বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। এই রাজী হওয়ার কারণের ইঙ্গিত আগের পরিচ্ছেদে আছে। বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার পরে অমল ভূপতির ক্লিষ্ট চেহারা দেখে তার কারণ চারুকে জিজ্ঞাসা করে। চারু বলে, 'কই, তা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধহয় গাল দিয়ে থাকবে।' এইখানে চারুর insensitivity হঠাৎ অমলের চোখ খুলে দিচ্ছে—'অমল একবার তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল কি ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হওয়া এবং বিয়ে করতে চলে যাওয়ার মধ্যে অমল 'সন্ধান দ্বারা তাহার (ভূপতির) দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল।......তাহার পর সে চারুর কথা ভাবিল—নিজের কথা ভাবিল—কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল—সবেগে বলিল, চুলোয় যাক আকাশের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো ! আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ !' (যেসব সরল পাঠক অমল-চারুর সম্পর্কের মধ্যে বৌদি-দেবরের মধুর সম্পর্কের বেশি কিছু দেখেন না, তাদের এই 'কর্ণমূল লোহিত' হওয়ার ব্যাপারটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি)।

এখানে চিত্রনাট্যকারকে কতগুলি ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে—

(১) উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর মন্দা-উমাপদ ভূপতির আশ্রয় ছেড়ে ময়মনসিংহ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই যাওয়ার আসল কারণ সম্পর্কে কি চারু বা অমলের কোনোই অনুসন্ধিৎসা নেই ? তারা কি এ-ব্যাপারে একেবারে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে যাবে ? চলচ্চিত্র দর্শকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(২) উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার পর ভূপতির 'শুষ্ক, বিবর্ণ' মুখ দেখে অমলের দাদা সম্পর্কে উদ্বেগ হচ্ছে। এর কিছুক্ষণ আগেই ভূপতি চারুর কাছে গেছে। অথচ ভূপতির চেহারা দেখে চারুর মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। চারুর এই চরম insensitivity ও অন্যমনস্কতায় (যার নিদর্শন গল্পের প্রথমার্ধে পাওয়া যায় না) কেবল এ কথাই মনে হতে পারে যে অমলের প্রতি তার আকর্ষণ দেবরের প্রতি বৌঠানের স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আসলে তার involvement অত্যন্ত গভীর। এ যদি না হবে তাহলে বলতে হয় চারুর আচরণ এ দৃশ্যে তার পূর্ববর্ণিত আচরণের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেনি। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিকে বেছে নেবার স্বাভাবিক অধিকার চিত্রনাট্যকারের আছে, এবং আমি তাই করেছিলাম।

(৩) বৌদির মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে এক কথায় বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে এটাও পরিষ্কার হয় যে অমলের দিক থেকে তেমন involvement নেই—বা থাকলেও অমল সেটাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। ভূপতির দুর্দশার কথা জানতে পেরে ভূপতিকে সাহায্য করার বাসনার মধ্যেই অমলের maturity-র সূত্রপাত এবং কাহিনীর শেষাংশে এটাই অমল-চরিত্রের dominant note বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এটা লক্ষণীয় যে বিয়ের পর অমল চারুর সঙ্গে আর কোনোই সম্পর্ক রাখছে না।

একক বিচারে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই ঘটনাবলী থেকে চারু-অমল চরিত্রের যে-সূত্রগুলি ধরা পড়েছে, তারই উপর ভিত্তি করে ছবির মধ্যপর্ব রচিত হয়েছিল।

মন্দা-অমলের দুপুরের দৃশ্যের পর আমরা রাত্রে চারুর ঘরে যাই। চারু অমলের উপর অভিমান করে আছে। ভূপতি এসে অমলের বিয়ে-সম্বন্ধে কথা তোলে। চারু বলে, 'ভালোই তো—ওকে বললেই রাজী হবে।' ভূপতি অমলকে ডেকে পাঠায়।

অমল : দাদা—প্রুফগুলো এখনো দেখা হয়নি।

ভূপতি : (কোপের ভাণ করে) : কেন ?

অমল : আমার একটা লেখা নিয়ে একটু—

ভূপতি : কী লেখা ?

অমল : এমনি—কিছু না—

ভূপতি : যাও, নিয়ে এসো. আমি দেখব।

মূল গল্পে ভূপতি অমলের লেখা পড়ে বলে—'বেশ লিখেছ। কিন্তু আমাকে কেন ? এসব কবিত্ব কি আমি বুঝি ?' এই উক্তিতে অমল-ভূপতির মধ্যে যে একটা

amusing বৈপরীত্যের ইঙ্গিত আছে, সে-দিকটা এই বিবাহ প্রস্তাবের দৃশ্যে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

অমলের লেখা পড়ে তার মাথামুণ্ডু না বোঝার ভাণ করে ভূপতি বলে—'না হে, তুমি একটা বিয়েই কর।' সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব না তুলে ভূপতি একটু ঘুরিয়ে করছে—এই আর কি। মশারির পেছন থেকে অভিমানী চারু অমলকে উসকিয়ে দেয়। বৌঠান-দেবরের ঝগড়া লেগে যায়। ভূপতি বলে—'আচ্ছা, ছেলেমানুষী করছ কেন ? তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি, অমল। বিয়ের পর শ্বশুর জামাইকে বিলেতে পাঠাবেন।'

বিলেত যাবার আশায় অমলের সাময়িক মনের দোলা, চারুর tension, ভূপতির অমলকে আরো বেশি করে প্রলুব্ধ করা, এবং অবশেষে বিলেত সম্পর্কে অনীহার অজুহাতে অমলের প্রস্তাবে অসম্মতি জানানো (অমল 'না' বলছে না ; বলছে 'সময় চেয়ে নাও—একমাস'—কারণ এই প্রস্তাবেই তাকে পরে সম্মতি দিতে হবে)। এই অসম্মতিতেই চারুর মানভঞ্জন। এ-দৃশ্যে মূলের চরিত্র বা থীমের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ, ভবিষ্যতে অমলের বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হওয়া এবং বিলেত যাওয়ার পূর্বাভাস এখানে দেওয়াতে, চলচ্চিত্রের সংকুচিত পরিসরে ঘটনাটা আকস্মিক বলে মনে হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

এর পরেই মন্দা-উমাপদকে নিয়ে একটি নতুন দৃশ্য। এর প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ও উমাপদর Villainy-এর একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

অমলের গানের দৃশ্য দিয়ে ছবির তৃতীয় পর্বের শুরু। হালকা মেজাজে আরম্ভ করে আচমকা চারু-অমলের দ্বিতীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত। অমলের লেখা সরোরুহ পত্রিকা ছাপিয়েছে এ-খবর অমল মন্দাকে প্রথম দেয়। চারু অভিমানে অমলের মুখের উপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। ভূপতিকে চারু-অমলের সংঘর্ষের জালে আগেই জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে চারু ও অমল-মন্দার জালে ভূপতি জড়িয়ে পড়ে একটি জটিল মিশ্ররসাশ্রিত চতুষ্কোণের সৃষ্টি করে। এ দৃশ্যে রুদ্রমশাই লক্ষ করবেন যে চারটি চরিত্রই তাদের রবীন্দ্রকল্পিত সত্তা বজায় রেখে আচরণ করছে। মন্দা দর্শক হিসেবে চারু-অমলের মান-অভিমানের পালা উপভোগ করছে—যদিও অমলের দিক থেকে চারুকে খুশি করার তাগিদে সে কিছুটা ক্ষুণ্ণ। অমল দুজনকে একসঙ্গে খুশি করতে ব্যস্ত। দাদার সামনে পড়ে সে উচ্ছ্বসিতভাবে তার লেখা প্রকাশিত হবার খবর দেয়, ভূপতি বলে—'বলো কে election জিতবে — Tory না Liberal ?' চারু অভিমানে টৈটম্বুর ; দরজায় টোকা পড়াতে অমল মনে করে সে চেঁচিয়ে ওঠে— কাজ করছি !' কিন্তু ভূপতির গলা শুনে দরজা খুলে দিয়ে অভিমান সংবরণ করে দরজা বন্ধ করার মিথ্যা কারণ সৃষ্টি করে। ভূপতি চারুর কথা সরল মনে বিশ্বাস করে আরশুলা খুঁজতে শুরু করে এবং খুঁজে না পেয়ে চারুকে রাজনীতির খবর বলতে থাকে।

এ দৃশ্যে চারুর মানভঞ্জন হয় না—কারণ অমল তার স্বভাবসুলভ insensitivity হেতু চারুর অভিমানের মাত্রাই বুঝতে পারে না ; সুতরাং

মানভঞ্জনের কোনো চেষ্টাই সে করে না। বরং (মূলেরই মতো) সে মন্দার কাছে গিয়ে গলা উঁচিয়ে বলে—'যাই, বন্ধুমহলে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।'

এর পরের ঘটনা মূলেরই অনুসরণে রচিত। 'সে লিখিবে—অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে। মন্দার সঙ্গে তাহার যে অনেক প্রভেদ একথা সে প্রমাণ না করিয়া ছাড়িবে না।'

চারুর লেখার প্রথম প্রচেষ্টা যে অমলের লেখারই সামিল তার ইঙ্গিত তার শিরোনামাতেই ছবিতে দেওয়া আছে। অমলের লেখার নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ', 'শ্রাবণের মেঘ', 'অমাবস্যার আলো'—চারু লেখে—'কোকিলের ডাক।' কোকিলের ডাক শুনেই চারু তৎক্ষণাৎ তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু স্থির করে। অর্থাৎ এখানে অনুপ্রেরণার কোনো প্রশ্ন নেই। আর তাই চারুর কলম দিয়ে লেখা বেরোয়ও না—কারণ অমলের সাবলীল অগভীর ভাবোচ্ছ্বাস তার অনায়ত্ত।

অনেক চিন্তা, অনেক কাগজ ছেঁড়ার পর উৎসের সন্ধান মেলে। চারু তার গ্রামের স্মৃতিকথা লেখে। লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা হাতে নিয়ে অমলের কাছে গিয়ে তাই দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর ভূপতির জন্য নকশা-করা চটি এবং মন্দার হাত থেকে পানের বাটা ছিনিয়ে নিয়ে পান সেজে অমলকে দিয়ে, অমলের হাত থেকে পত্রিকা টেনে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তবে চারুর অভিমানের পালা শেষ।

এই একটি পাঁচ মিনিটের দৃশ্যে কতগুলি জিনিস বলা হয়েছে তার একটা তালিকা দিলে হয়তো রুদ্রমশাই সিনেমার compression-এর ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পারবেন।

(১) চারুর স্বাভাবিক সাহিত্য প্রতিভা অমলের চেয়ে বেশি।

(২) চারুর কাছে লেখা প্রকাশ করাটা বড় কথা নয়, আসল কথা অমলকে প্রমাণ করা যে সে মন্দার চেয়ে অনেক বেশি গুণী।

(৩) মন্দার হাত থেকে পানের বাটা ছিনিয়ে নিয়ে চারু প্রমাণ করে যে অমলের উপর তার একাধিপত্য ; অমল-চারুর এ-রাজ্যে মন্দার প্রবেশাধিকার নেই।

(৪) ভূপতির জন্য তৈরি নকশা-করা চটি অমলকে দেওয়ার ব্যাপারে ভূপতির প্রতি চারুর কর্তব্যের অবহেলার প্রথম ইঙ্গিত। অনুরূপ অবহেলার নিদর্শন মূলের অনেক জায়গাতেই আছে।

দৃশ্যের শেষে চারু অনুতাপে বিহ্বল হয়ে অমলের জামা আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। অমলকে দেখি জানলার ধারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। মূলে অমলের উপলব্ধি—'গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল—' এ দৃশ্য তারই চিত্র সংস্করণ। Context এখানে আলাদা—কিন্তু তারও কারণ আছে। মূল গল্পে অমল যে-অবস্থায় চারুর মনোভাব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে—সেরকম অবস্থায় তাকে তার আগে অনেকবার পড়তে হয়েছে। মনে রাখা দরকার—ভূপতির 'শুষ্ক বিবর্ণ' মুখের কারণ কিন্তু অমল তখনও জানে না—কাজেই Crisis-এর কারণ বা গুরুত্ব না জেনেই

কেবলমাত্র ভূপতি সম্পর্কে চারুর ঔদাসীন্য থেকেই যদি অমলের উপলব্ধি আসে, তবে ছবিতে অন্তত সেটাকে Clairvoyance বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

অথচ অমলের এই উপলব্ধি চিত্রনাট্যের পক্ষেও অপরিহার্য। এর একমাত্র উপায় হল চারুর আচরণকে আরো স্পষ্ট কোনো রূপ দেওয়া। এই জন্যেই চারুর ক্রন্দনের দৃশ্য। রুদ্ধ অভিমানের দ্বার খুলে গেলে চারুর পক্ষে ক্রন্দন অসম্ভব নয়। ভূপতির সামনেই যদি তার পক্ষে অমলের জন্য শোক প্রকাশ সম্ভব হয় (অষ্টম পরিচ্ছেদ) তাহলে অমলের সামনে হবে না কেন—বিশেষত আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই মেনে নিয়েছি যে চারু অমলের প্রতি আসক্ত?

এই কারণেই এই কান্নার দৃশ্য মূলানুগ হয়নি—এ অভিযোগের কোনো মানে আমি বুঝি না। Action-এর সাহায্যে এ-দৃশ্যে যা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ভাষায় তার চেয়ে কম কিছু বলেননি। যাদের হাতের কাছে নষ্টনীড় নেই, তাদের জন্য এই উদ্ধৃতি—'উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার বার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্রপার হইতে যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান! চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল তুমি রাগ করিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনো দোষ করি নাই! তুমি যদি ভালো মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধহয় আমি এ-দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত, চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত—অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সার ভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।'

চারুর ভেঙে পড়ার দৃশ্যের পরের দৃশ্যে ভূপতির বন্ধুমহলের একটা ইঙ্গিত পাই। নিশিকান্ত চরিত্রের উল্লেখ মূলে একাধিকবার আছে—এই দৃশ্যে তাকে রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই দৃশ্যেই, আসর থেকে উঠে গিয়ে উমাপদকে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি করতে দেখা যায়। এখানে মূল গল্প থেকে যে-পরিবর্তন হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

মূল গল্পে উমাপদ ধরা পড়ছে। ধরা পড়াটা উমাপদর দিক থেকে অন্তত আকস্মিক বলে মনে হয় না। সে যেন ধরা পড়ার জন্য প্রস্তুতই ছিল। তবে কি উমাপদ মূর্খ? কিন্তু যেভাবে সে তলায় তলায় কাজ গুছিয়ে নিয়েছে তা থেকে তো তা মনে হয় না। শঠতার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতার এ-সমন্বয় ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য করা সম্ভব হত না। মূল কাহিনীতে এই সমন্বয়ের ফলে এই বিশেষ পর্যায়ে ভূপতি-উমাপদকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-দৃশ্য রচনা করেছেন, সেটা সজীব হতে পারেনি, উমাপদও একটি মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এইসব কারণেই উমাপদকে একটা পুরোদস্তুর calculating villain হিসেবেই কল্পনা করতে হয়েছিল। এই উমাপদর পক্ষে ভূপতির সর্বনাশ সাধন করে ধরা পড়ার আগেই মিথ্যা বলে পলায়ন করা স্বাভাবিক। এতে ভূপতির disillusionment-এর মাত্রা (ট্র্যাজেডির জন্য যেটার আসল প্রয়োজন) কিছুই কমে না। আর Calculating বলেই উমাপদর আসল রূপটি একসঙ্গে কাজ করেও

ভূপতি ধরতে পারে না।

আলোচ্য নৈশদৃশ্যের উপাদান হল ভূপতির আসরে রাজনীতি-আলোচনা, রামমোহনের গান (এই দুই-এরই উদ্দেশ্য Period atmosphere রচনায় সাহায্য করা), উমাপদর টাকা চুরি, চারুর ঘরে চারু-অমলের কথোপকথন, উমা-মন্দার প্রস্থানের ইঙ্গিত ও সবশেষে নিশিকান্ত কর্তৃক চারুর বিশ্ববন্ধুর প্রবন্ধটি ভূপতির গোচরে আনা।

এর আগের দৃশ্যে আমরা দেখেছি চারু অমলকে মন্দার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। সুতরাং চারু-অমলের এ-দৃশ্যে মন্দা নেই। হাজার হোক, মন্দারও তো অভিমান বলে একটা জিনিস আছে! বৈঠকখানায় রামমোহনের গানের জের টেনে চারু-অমল বিলেত নিয়ে আলোচনা করে। চারু অমলের বিয়ের প্রস্তাবের প্রসঙ্গটা চেপে রাখতে পারে না, কারণ অমল তার মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেনি। অমল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। মূল গল্পেও যতদিন না তার পক্ষে দাদার আশ্রয় ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন অমল বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিচ্ছে না। কথোপকথন যাতে নিছক প্রেমালাপে পর্যবসিত না হয়, তার জন্য অমলকে দিয়ে 'ব'-এর অনুপ্রাসে কথাবার্তা বলার একটা সূত্রপাত করানো হয়েছিল। চারুর এতে আপত্তি নেই—সেও ব-এর খেলায় মেতে ওঠে—কারণ এখনও পর্যন্ত তাদের বিচ্ছেদের কোনো পূর্বাভাস চারু পায়নি।

এর পরের দৃশ্যেই ভূপতি কাগজওয়ালার কাছ থেকে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারে।

সেইদিন রাত্রে চারু-অমলকে দেখি বারান্দায় (শোবার ঘরের পরিবেশটি এ-দৃশ্যে অবশ্য-পরিহার্য বলেই মনে হয়েছিল)। ভূপতির ফিরতে দেরি দেখে দুজনেই উদ্বিগ্ন।

ভূপতির বিপদের আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে কি চারুর মনে অমলকে হারাবার একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে না? বিশেষত অমলের দিক থেকে চারুর মনোভাবের পরিষ্কার reciprocation-এর কোনো ইঙ্গিত যখন অমল দেয়নি? যদি আমরা মেনে নিই যে চারুর মনোভাব কেবলমাত্র বৌদির মনোভাব নয়, প্রেমিকারও বটে—তবে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হবে।

তাই অমল দাদার খোঁজ করতে যাবার সময় তার হাত চেপে ধরে চারু বলে—'যাই ঘটুক না কেন—কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না!' অমল বলে, 'ছাড়ো বৌঠান। দেখি আমি দাদার কী হল।' মূলে কাহিনীর শেষে অমলের দাদার প্রতি Loyalty-র ইঙ্গিত আছে, এখানে তারই সূত্রপাত। দাদার প্রতি চারুর ঔদাসীন্যে অমলের বিস্ময়—এও মূলেরই অন্তর্গত।

ভূপতি তার ট্র্যাজেডির কথা অমলকে বলে। নষ্টনীড়ে এ-ঘটনা অনুপস্থিত। গল্পে আছে 'খোঁজ নিয়ে অমল ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছে।' অমলের এই জানাটা জরুরি ঘটনা। তবে কি এই খোঁজ নেওয়ার জন্য নতুন চরিত্র ও নতুন দৃশ্যের সংস্থাপন করতে হবে? নতুন চরিত্র ও দৃশ্যের উদ্ভব বেশি আপত্তিকর, না ভূপতির মুখ দিয়ে ঘটনাটা অমলকে বলানো বেশি আপত্তিকর? 'উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা

সম্পর্কে ভূপতি চারুলতাকে সব কথা বলিতে পারে নাই।'—এটা স্বাভাবিক কারণ উমাপদ চারুর আপনভাই। কিন্তু অমলকে কোনো কথা না বলার কোনো চরিত্রগত কারণ আছে কি, বিশেষত অমল যখন কাগজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নয়? আমার তো মনে হয় না। তাছাড়া এটা নাটকীয়ও বটে—কারণ এখানে ভূপতির উমাপদর উপর বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে অমলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের একটা চমৎকার Parallel টানার সুযোগ আছে। চিত্রনাট্যে তাই এই পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

অমলের সঙ্গে কথা বলে ভূপতি শোবার ঘরে আসে। চারু ভূপতিকে আলিঙ্গন করে, যদিও মুখে সহানুভূতিসূচক কিছু বলার ছলনাটুকু সে করতে পারে না। ভূপতি তার আলিঙ্গনের ভুল অর্থ করে। সে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলে, 'এবার থেকে তোমাকে আমি অনেক সময় দিতে পারব। তোমার সতীনকে দূর করে দিয়েছি।'

ভূপতির সঙ্গে কথোপকথনের ফলে অমল ভূপতির দুরবস্থার কথা বুঝতে পেরেছে। অমলের যে maturity-র ইঙ্গিত মূল গল্পে তার চিন্তায় ব্যক্ত করা হয়েছে, এর পরের দৃশ্যে সিনেমার রীতি-অনুযায়ী অমলের action দ্বারা সেটা জানানো হয়। অমল ভূপতিকে চিঠি লিখে রেখে তার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হবার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

পরদিন সকালে ভূপতি চিঠি পেয়ে অমলের এই চলে যাওয়ার অলিখিত অন্তর্নিহিত কারণটি অবশ্যই টের পায় না। চারু তার প্রচণ্ড ক্ষোভ ভৃত্যের প্রতি অযথা আক্রোশে এবং অমলের প্রতি বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে রূপান্তরিত করে ('দেখ, খোঁজ নাও—ও ঠিক ওই বর্ধমানেই গেছে!')।

শ্রীরুদ্র বলেছেন, অমল চলে যাবার পর আরো ছয়টি অধ্যায়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভূপতিকে দিয়ে তার আসল ট্র্যাজিডিটি উপলব্ধি করিয়েছেন, আর আমি তার সব কিছুই বর্জন করে সংক্ষেপে বাজিমাৎ করতে চেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে ভূপতি-চারু সম্পর্কের নানান সূক্ষ্ম ও জটিল টানাপোড়েনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই অংশটিকে প্রায় বলা যেতে পারে Variations on the theme of incompatibility। এই অংশের দরদ, এর কাব্যময়তা, এর আবেগ অনস্বীকার্য। কিন্তু যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যেভাবে লেখক ভূপতিকে উপলব্ধির মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করলে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায় (এখানেও সেই 'প্লটের' ব্যাপার!)। আমার বিশ্বাস মূলের হুবহু অনুসরণ করলে এসব দুর্বলতা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠত।

মূল কাহিনীতে এই অংশের প্রথমে দেখি ভূপতি চারুর কাছে আসার চেষ্টা করছে। কাগজ গিয়ে ভূপতির এখন সময়ের অভাব নেই। সে অমলের মতোই সাহিত্য রচনা করে চারুর হৃদয়ে স্থান পেতে চায়। এ-প্রচেষ্টা ভারি Poignant। চারুর অবশ্যই এতে বেদনার উপশম হয় না, কারণ, অমলের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না; অমলের অভাব ভূপতি মেটাবে কি করে?

বিলেত থেকে চিঠি না আসায় চারুর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, চিঠি যে আদৌ আসেনি তা নয়। অমল ভূপতিকে চিঠি লিখেছে, এবং তাতে চারুকে

প্রণাম জানিয়েছে—একবার নয়, তিনবার। এই প্রণামটা অবশ্য চারুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো তাকে পীড়া দিয়েছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখি—'অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই/এক মেলে তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলায় পাঁচকথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্ত স্বরে তাহার স্বামীকে কহিল-আচ্ছা দেখ, বিলেতে একটা টেলিগ্রাম করে জানলে হয় না অমল কেমন আছে ? ভূপতি কহিল—'দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।'

তাই যদি হয়, তাহলে চারু অমলকে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা করছে ? অমলের ব্যস্ততার কারণ সে জানে। অমলের কুশল-সংবাদ সে ভূপতিকে লেখা চিঠিতেই পেয়েছে। প্রি-পেড টেলিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছু ইঙ্গিতের আশা করে যে তার প্রতি অমলের আকর্ষণ অটুট রয়েছে ? দাদার অনুরোধে বিয়ে করে এবং বিলেত গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানতে চাইছে।

তার পর টেলিগ্রাম পাঠানোর ঘটনাটিতে আসা যাক। ভূপতির সামনে এ-কাজ করা চলে না, পাছে ভূপতির সন্দেহ হয়। সুতরাং চারুকে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। দিন দু-এক পরে চারু ভূপতিকে বলল—আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার ?

ভূপতি : কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি ?

চারু : না—কোনো অসুখ না। জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

'ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাওড়া স্টেশন অভিমুখে ছুটিল। পথে এক সার গরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল। এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল।'

বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। রুদ্রমশাইও একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে এই ঘটনার একটি অংশও ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো না।

চারুর টেলিগ্রামের কথা জানতে পেরে 'একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে (ভূপতিকে) বিদ্ধ করিতে লাগিল।'

এই সন্দেহ বদ্ধমূল হচ্ছে কি ভাবে ? 'চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে, লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার কানাকানি করিয়া থাকে, কিছুতেই তাহার চেতনামাত্র নাই। এমনি হইল হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইত। অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।'

গল্পের এই অংশে, ভূপতির যেখানে কাজ নিয়ে মেতে থাকার কোনো প্রশ্ন ওঠে না—চারুকে সঙ্গ দেবার জন্যই যখন সে ব্যস্ত এবং চারুর মনোভাব যেখানে তার আচরণে এতই প্রকট যে 'লোকে' তার সম্বন্ধে কানাকানি করে, সেখানে ভূপতির

দীর্ঘকালব্যাপী এই marathon incomprehension-এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কোথায় ? স্ত্রীকে তো সে জেনেশুনেই অবহেলা করেছে ; সে-সম্বন্ধে অপরাধবোধের ইঙ্গিতও গল্পে আছে ; চারুর সঙ্গে তার basic incompatibility সম্বন্ধে সে সচেতন। তার উপরে, অমলের প্রতি চারুর স্নেহ-মমতার ইঙ্গিতও সে অনেকবার পেয়েছে ; আর অকাট মূর্খ হিসেবেও ভূপতিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেননি। আগেও বলেছি, আবার বলছি, ভাষার গুণে পড়ার সময় এসব খটকা মনে লাগে না ; কিন্তু চিত্রনাট্য রচনাকালে যখন মূল কাহিনীর নির্মম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, যখন চরিত্রগুলিকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে হয়, গল্পের পরিবেশ চোখের সামনে মূর্ত করে তুলতে হয়, সময়ের পরিষ্কার সূত্র ধরে ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিকতা রচনা করতে হয়—তখনই এ জাতীয় ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। কাহিনীর অদলবদল যে হয়, তা এই কারণেই —খামখেয়ালবশত নয়, বা পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরি করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়। রুদ্রমশাই প্রশ্ন করবেন—তবে নষ্টনীড় গল্প নেওয়া কেন ? উত্তরে বলব—চারুলতা ছবি করার জন্যই।

চারুলতার উপসংহার নষ্টনীড়ের উপসংহার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিনা সেইটে বিচার করে বর্তমান আলোচনা শেষ করব।

নষ্টনীড়ে অমল চলে যাবার পর ভূপতির আচরণের মূল কথা হল চারুর কাছে আসার চেষ্টা করা। এতে যে সময়ের ব্যাপ্তির ইঙ্গিত আছে—ছবিতে সে ইঙ্গিত দেবার জন্যই কাহিনীর পট পরিবর্তন করা হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীকে তাই দেখা যায় সমুদ্রতটে—স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। চারু কি অমলকে ভুলতে পেরেছে ? এর কোনো ইঙ্গিত এ-দৃশ্যে দেওয়া হয়নি। ভূপতি থাকায় সে-ইঙ্গিত দেওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ভুলতে পেরেছে মনে হলে, ভবিষ্যতে ভুলতে না-পারার সত্যটা আরো মর্মান্তিক ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব। সমুদ্রতটে তাই অমলের কোনো উল্লেখ নেই।

চারু ভূপতির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বললেও, ভূপতির প্রেমালাপের প্রচেষ্টায় সে কোনো মন্তব্য করে না। বরং ভূপতির পাকা চুল তুলে স্বামীর প্রতি একটা unromantic মনোভাবই সে প্রকাশ করে। মূল কাহিনীতেও চারু ভূপতির সঙ্গে কথোপকথনে কখনও কোনো রূঢ় ভাব প্রকাশ করেনি ; ছবির এই দৃশ্যেও ভূপতির কাগজ বার করার প্রস্তাবে চারু উৎসাহই দিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই ভূপতি চারুর হাতে অমলের লেখা চিঠি তুলে দেয়। ভূপতি ঘর থেকে চলে যাবার পর চিঠি না খুলেই চারু পুঞ্জীভূত রুদ্ধ বেদনার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে। এই সময়ে আচমকা ফিরে এসে দরজার গোড়া থেকে ভূপতি ক্রন্দনরত চারুকে দেখে এবং তার বিলাপ শোনে—'ঠাকুরপো, তুমি কেন চলে গেলে ঠাকুরপো ! আমি কী অপরাধ করেছিলাম যে তুমি আমায় না বলে চলে গেলে' ইত্যাদি।

ছবির ভূপতি কোনোখানেই এমন নির্বোধ নয় যে এই বিলাপকে সে শুধুমাত্র প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ দেবরের জন্যে বৌঠানের বিলাপ বলে ভুল করতে পারে।

তাও ভূপতির মনে সম্পূর্ণ উপলব্ধি আনবার জন্য তাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলন্ত ঘোড়াগাড়িতে একা অবস্থায় দেখানো হয়েছিল, এবং তার চোখেমুখে ক্রমান্বয়ে অবিশ্বাস, বেদনা, হতাশা এবং সবশেষে চারুর প্রতি অনুকম্পার ভাবের সঞ্চার করা হয়েছিল।

ভূপতি বাড়িতে ফিরে আসে।

উনবিংশ শতাব্দীর গল্পে divorce-এর প্রশ্ন আসে না। তবে কি চারুকে ভূপতি একা ফেলে রেখে চলে যাবে—যেমন মূল কাহিনীতে সে করেছে? চারুর 'অপরাধ' কি ভূপতির দৃষ্টিতে একেবারেই অক্ষমনীয়, নাকি সে মনে করে যে চারুকে একা থাকতে দিলে সে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণা ভোগ করবে? চারুর সঙ্গে একটা বিশদ বোঝাপড়ার তাগিদও কি সে বোধ করবে না? বিশেষ করে এ-অবস্থার জন্য তার নিজের দায়িত্বও যখন কিছু কম নয়?

আমার মতে চারুকে পরিত্যাগ করে মহীশূর যাত্রা রবীন্দ্র-বর্ণিত ভূপতির চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।

কিন্তু তাই বলে এ-অবস্থায় নতুন করে সুখনীড় রচনা সম্ভব কি? মিলন সম্ভব কি? দুজনেই পরস্পরের দোষ ক্ষমা করে একসঙ্গে ঘর করা সম্ভব কি?

যেটাই সম্ভব হোক না কেন—সেটা সময়সাপেক্ষ। দুজনেই এখন দুজনের কাছে অত্যন্ত বেশি পরিচিত, তাই মনে হয় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য।

এ-দৃশ্যে তাই হাতে হাত মিলতে পারে না। ভবিষ্যতে মিলবে কি? জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথও জানার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের মতো ঘর ভেঙে গেছে, বিশ্বাস ভেঙে গেছে, ছেলেমানুষী কল্পনার জগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবের জগতে নেমে এসেছে দুজনেই। এটাই বড় কথা। এটাই নষ্টনীড়ের থীম।

আমার মতে চারুলতায় এ-থীম অটুট রয়েছে।

পরিচয়, ১৯৬৪
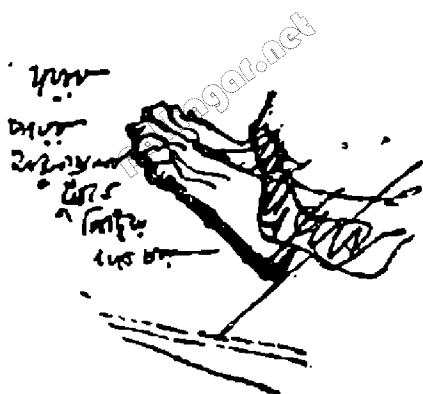
ওরফে ইন্দির ঠাকুরণ

চুনিবালা দেবীকে যেদিন প্রথম তাঁর 'পাইকপাড়ার বাড়িতে দেখতে যাই, সেদিনকার মনের অবস্থা ভোলবার নয়। ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়েগেছে। প্রসন্ন, সেজোঠাকুরুণ ও নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির করা আছে। বাকি আছে কেবল ইন্দির ঠাকুরণ।

"পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দূরের জিনিষ আগের মত ঠাহর হয় না।"—বিভূতিভূষণের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিনেত্রী নির্বাচন সহজ কথা নয়, বিশেষত যখন সংবাদপত্রে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে : 'এ ছবিতে মেক-আপ ব্যবহার করা হবে না।' বর্ণনা অনুযায়ী বৃদ্ধার সন্ধান যে করা হয়নি তা নয়, কিন্তু চেহারাই ত সব নয়! সবচেয়ে বড় সমস্যা হল—৭০/৭৫ বছরের বৃদ্ধার পক্ষে আউটডোরের এই হাড়ভাঙা খাটুনি সহ্য হবে কি না। তারপর, প্রায়ই দেখা গেছে, জরার প্রকোপে মস্তিষ্কের অল্পবিস্তর বিকার ঘটে থাকে। ইন্দিরের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করা চলবে ত? অর্থাৎ তিনি সংলাপ মুখস্থ করে ক্যামেরার সামনে বলতে পারবেন ত? বার্ধক্য, অভিনয় দক্ষতা, শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা ও সুস্থ মস্তিষ্ক—একাধারে এই চারের সমন্বয় আদৌ সম্ভব কিনা সেটা বিবেচনা না করেই আমরা ছবির কাজ শুরু করেছিলাম, এটা ভাবতেও এখন ভয় করে।

চুনিবালা দেবীর হদিস দেন রেবা দেবী (পথের পাঁচালীর সেজোঠাকরুণ)। চুনিবালা দেবী নাকি নিভাননী দেবীর মা, তিনি দুটো নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেছেন, এবং তারও আগে অর্থাৎ তারাসুন্দরী নগেন্দ্রবালার যুগে মঞ্চে অভিনয় করেছেন। ঠিকানা সংগ্রহ করে একটি রবিবারের সকালে আমরা নিভাননী দেবীর বাড়িতে গেলাম।

চুনিবালা আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে'-বর্ণনার সঙ্গে অমিল হোল না।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি ছড়া জানেন কোন? আবৃত্তি করতে পারেন?

'ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি' ছড়ার দশবারো লাইনের বেশী আমি কখনও শুনিনি।

চুনিবালার মুখে এর পরিসর বৃদ্ধি হল আশ্চর্যভাবে। বোধহয় ছড়াটির আদি ও অকৃত্রিম সংস্করণটিই ইনি আবৃত্তি করলেন। শ্রদ্ধা হোল প্রবীণার স্মরণশক্তি দেখে। অনেকটা আশঙ্কা কেটে গেলো। এবারে দ্বিতীয় জরুরী প্রশ্নটি করলাম।

—এখান থেকে ভোর ছ'টায় রওনা হয়ে পনের মাইল দূরে গ্রামে গিয়ে স্যুটিং করে আবার সন্ধ্যাবেলা সেই পনের মাইল পথ মোটরে ফিরে আসতে পারবেন?

—খু-উ-ব।

এবারে বাকি আশঙ্কাটুকু কেটে গেলো।

চুনিবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালি হত না। আমরা যে কোন ব্যাপারেই ফাঁকি বা মেকির আশ্রয় নিচ্ছি না, সেটা উনি গোড়াতেই ধরে ফেলেছিলেন। 'আপনারা যখন তরুণীকে মেক-আপ করে বুড়ি না সাজিয়ে, আমাকে বেছে নিয়েছেন, তখনই বুঝেছি কোনদিকে আপনাদের ঝোঁক। এবং এই বাস্তবের দিকটা অন্তত ইন্দিরের ভূমিকায় যাতে বজায় থাকে তার জন্য তিনি সব সময়ে সচেতন থাকতেন। একটা উদাহরণ দিই। ইন্দিরের পরবার জন্য আমরা একটা ছেঁড়া থান চুনিবালাকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম 'আপনি ইচ্ছেমতো গেরো বেঁধে ছিদ্রগুলোর একটা ব্যবস্থা করে নেবেন —যেমন ইন্দিরের অভ্যাস ছিল।' কিন্তু কিছুদিন কাজের পর থানটি জীর্ণ থেকে জীর্ণতর অবস্থায় পৌঁছাল। একদিন কানে এলো, চুনিবালা বলছেন, 'এ কাপড়ের যে দশা এতে লজ্জা ঢাকা যায় না।' পরের দিন একটি নতুন থানে ছেঁড়ার মাত্রাটা বেশ কিছু কমিয়ে তাকে দেওয়া হলো। চুনিবালা কিছু বললেন না। ইন্দিরের বেশে তিনি যখন 'সেট'এ এলেন, দেখা গেলো তিনি নতুনটি বাতিল করে পুরোনো থানটাই পরেছেন।

স্মরণশক্তির কথা বলছিলাম। চুনিবালা যে ভাবে 'কনটিনিউইটির' খুঁটিনাটি মনে রাখতেন সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের খাতায় ভুল থাকলেও, তাঁর মাথায় ভুল থাকতো না। 'আমার ডান হাত যে ভিজে ছিল সেদিন', 'কই, আমার মুখে ঘাম দিলেন না', 'এ শটে ত আমার গায়ে চাদর থাকবে না', 'আমার পুঁটলি কি ডান হাতে ছিল? না, পুঁটলি বাঁ হাতে। ঘটি ডান হাতে—' এ ধরনের কথা তাঁর কাছে প্রায়ই শোনা যেতো।

চুনিবালার অনেক গুণের মধ্যে তাঁর গানের গলাটি আবিষ্কার হয় বেশ পরের দিকে। একদিন স্যুটিং-এর শেষে হরিহরের দাওয়ায় বসে বৈকালিক চা-পানের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গান জানেন? উপন্যাসে বা চিত্রনাট্যে ইন্দিরের গানের উল্লেখ ছিল না, তবে কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, ইন্দিরের কোন অলসমুহূর্তে তার সাদা গলায় গাওয়া একটি গান দিতে পারলে মন্দ হয় না।

চুনিবালা বললেন: ধর্ম্মমূলক চলবে কি?

বললাম, চলবে।

ইন্দির গাইলেন:—

মন আমার হরি বল হরি বল।

হরি হরি হরি ব'লে

ভবসিন্ধু পার চল।
জলে হরি স্থলে হরি—
চন্দ্রে হরি সূর্যে হরি--
আকাশে—বাতাসে—হরি—
হরিময় ভূমণ্ডল !

গানটি রেকর্ড করা হোল।

এর কিছুদিন পরেই অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় এক বছর পরে যখন স্টুডিওতে নৈশ দৃশ্য তোলা হচ্ছে, তখন ইন্দিরের গান গাইবার দৃশ্যটি তোলার ফুরসৎ হয়। চাঁদনিরাতে দাওয়ার পশ্চিম দিকটায় পা ছড়িয়ে বসে হাতে তাল রেখে ইন্দির গান গাইছে। ভাদ্র মাস। আবহে ব্যাঙ ও ঝিঁঝির ডাক। ক্যামেরা আস্তে আস্তে ইন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবে।

শট নেওয়ার কিছুক্ষণ আগে চুনিবালা বললেন, 'আরেকটা গান মনে পড়ছে আমার। এটা আরো ভাল। শুনবেন ?'

হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হোল
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা
ডাকি হে তোমারে।
শুনি, কড়ি নাইক যার
তুমি কর তারে পার।
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি
দেখ ঝুলি ঝেড়ে।
হরি দিন ত গেল, সন্ধ্যা হোল
পার কর আমারে···

'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের কোনো কোনো দৃশ্যে উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে পার্থক্য আছে। চুনিবালার কোনটাতেই আপত্তি ছিল না—কেবলমাত্র ইন্দিরের মৃত্যু দৃশ্যটি ছাড়া। তিনি বল্লেন, 'বইএ আছে বুড়ি চণ্ডীমণ্ডপে মরছে। আপনি দেখাচ্ছেন বাঁশবনে। ধার্মিক বুড়ি—তার কি বাঁশবনে মরাটা ভালো দেখায় ?' তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, বাঁশবনে আচমকা মৃতদেহের আবিষ্কার অপু-দুর্গার শিশুমনে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, ছবি ও নাটকের দিক দিয়ে তার মূল্য অনেক। চুনিবালা আর কিছু বললেন না। দৃশ্যটিতে আছে, দুর্গা বুড়িকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকতে দেখে তাকে ঘুমন্ত মনে করে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় ; কিছুক্ষণ বসা অবস্থায় থেকে হঠাৎ টাল হারিয়ে বুড়ির মৃতদেহ ধপ করে মাটিতে পড়ে। বলাবাহুল্য, এই দৃশ্যের বাস্তবের মাত্রা নির্ভর করে সম্পূর্ণ চুনিবালার উপর। তিনি যদি গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে তাঁর দেহকে মাটিতে ফেলতে পারেন, তবেই শট-এর ও অভিনয়ের সার্থকতা। এই কঠিন পরীক্ষায় চুনিবালা কী ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার প্রমাণ 'পথের পাঁচালী'তে রয়েছে। এবং এই দৃশ্যের শেষে

তাঁর মানসিক পরিতৃপ্তি ও শারীরিক গ্লানির যুগপৎ বিচিত্র অভিব্যক্তি আমার চিরকাল মনে থাকবে।

ইন্দিরের মৃত্যুদৃশ্য সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করে আমি লেখা শেষ করব।

ইন্দিরের শবযাত্রার দৃশ্যটি ছবির শেষের দিকে তোলা হয়। এটিও চিত্রনাট্যে ছিল না। ইন্দিরের মৃত্যু আরো মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত মনে করে এই দৃশ্যটি যোগ করা হয়। শবযাত্রার দৃশ্য মানেই বীভৎস এমন কেউ কেউ মনে করেন। আমি তা করি না। দুটি কারণে ইন্দিরের শবযাত্রা আমার মতে বীভৎস হয়নি। এক—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং যে সময়ে (সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই) দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল, এবং দুই, হরিধ্বনি বর্জন।

দর্শকের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকেন, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা—যারা 'বলহরি' শুনেই হরিবোল বলার লোভ সামলাতে পারেন না। হরিধ্বনি বর্জন করা হয়েছিল প্রধানত এদের কথা ভেবেই এবং এই বর্জনের সংকল্প, ও বুড়ির গানকে শবযাত্রার দৃশ্যে আবহসঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা, সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

ভোর পাঁচটায় মেঠো রাস্তায় শটের তোড়জোড় করতে করতে ট্যাকসিতে যখন চুনিবালা দেবী এসে উপস্থিত হলেন, তখনও তিনি জানেন না কোন্ দৃশ্যের জন্য তাঁকে আনানো হয়েছে। আমি কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে তাঁকে বললাম—'আজ আপনাকে খাটে চড়াবো।' চুনিবালা কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত না হয়ে বললেন: 'বেশ ত, এ অভিজ্ঞতা আর কজনের হয়? আমার আপত্তি নেই।' বাঁশের খাটে মাদুর বিছিয়ে ইন্দির ঠাকুরুণকে শুইয়ে রাজুর কাছ থেকে ভিক্ষে করে পাওয়া চাদরখানা দিয়ে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর ক্যামেরার জন্য একটি রিহার্সেল করে, শবযাত্রা শুরু হোল।

শট শেষ হয়ে যাবার পর খাটসুদ্ধ মাটিতে নামানো হয়েছে, দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চুনিবালা দেবী আর নড়েন না। আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। ব্যাপার কী? বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল।

হঠাৎ শুনি চুনিবালা দেবী বলছেন, 'শট হয়ে গেছে? কই, আমাকে ত কেউ বলেনি! আমি তাই মড়া হয়ে পড়ে আছি।'

আশ্চর্য অভিনয়!

ইন্দিরের কাজ এখানেই শেষ হোল।

মধ্যবিত্ত, শারদীয়: ১৯৫৫

দুই চরিত্র

বিজ্ঞাপনের কাজ ছেড়ে যখন সিনেমার কাজে অগ্রসর হই, তখন আমার কাছে চলচ্চিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিল্পের আকর্ষণ। অবিশ্যি সেই শিল্প মারফত কায়েমি ভাবে একটা রোজগারের বন্দোবস্ত হ'তে পারে এমন আশাও ছিল। কাজের আনন্দ এবং কাজের পারিশ্রমিক, এই দুই-এরও অতিরিক্ত কিছু যে চলচ্চিত্র থেকে লাভ হতে পারে সেটা গোড়ায় জানা সম্ভব ছিল না। আজ জানি যে, একটা ছবি নির্মাণের কালে এমন সব অভিজ্ঞতা হয় যার সঙ্গে হয়ত সে-ছবির সরাসরি কোন যোগ নেই, কিন্তু যা মনে গভীরভাবে দাগ রেখে যায়। আজ অবধি যে দশখানা ছবি করেছি, তার দৈনিক কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ মনে করতে বসলে সত্যিই বেগ পেতে হবে। কিন্তু সেই তুলনায় আশ্চর্য স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনে গাঁথা হয়ে আছে কিছু চরিত্র ও কিছু ঘটনা, যাদের আবির্ভাব এইসব ছবিকে অবলম্বন করেই। এ-হেন দুটি চরিত্র হলেন বোড়ালের সুবোধদা ও কাশীর রমণীরঞ্জন সেন মহাশয়।

বোড়াল গ্রামে 'পথের পাঁচালি'র সুটিং হবে বলে ঠিক হল। এক শীতের সকালে লটবহর নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে সুটিং-এর জায়গায় চলেছি, এমন সময় কানে এল—"ফিল্মের দল এয়েচে! বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো সব, বল্লম নিয়ে লাফিয়ে পড়ো!"

খোঁজ নিয়ে জানলাম ইনিই নাকি সুবোধদা—বছর দশেক যাবৎ বিকৃতমস্তিষ্ক। কাউকে নাকি বিশ্বাস করেন না ইনি—ফিল্মের দলকে ত নয়ই। আশ্চর্য এই যে, পরে সুবোধদার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল—শুধু আলাপ কেন, রীতিমত হৃদ্যতা। সুটিং-এর অবসরে প্রায়ই তাঁর দাওয়ায় গিয়ে বসতাম, আর গেলেই তিনি ঘর থেকে একটি ধূলিমলিন চটের থলি এনে তার থেকে আদ্যিকালের সব দলিলপত্র বার করে কোথায় তাঁর কত জমি আছে এবং কে তাঁকে কীভাবে ঠকাচ্ছে তার ফিরিস্তি দিতেন। অবিশ্যি সুবোধদার মতে শঠতা নাকি তাঁর স্বগ্রামবাসীদের মজ্জাগত। একদিন বললেন, "মনে করুন দশজন লোক অমাবস্যার রাত্তিরে সার বেঁধে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলেছে। বাতি নেই কারো হাতে—সব কঞ্জুস ত? সামনের লোকটি একটি খানায় পড়লেন, পড়ে আবার সামলে নিয়ে উঠে চলতে লাগলেন, কিন্তু পেছনের লোককে সাবধান করলেন না। এইভাবে একে একে দশজনের দশজনই

থানায় পড়ল, কিন্তু পাছে পরোপকার হয়ে যায় তাই কেউ টুঁ শব্দটি করলেন না। এই হল বোড়ালের লোক।"

নাম ধরে খুব কম লোককেই ডাকতেন সুবোধদা। 'ওই যে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে—ও কে জানেন? রুজভেল্ট। ওর হাবভাব ভুলবেন না যেন। ও ভারী শয়তান।'

রুজভেল্ট, চার্চিল, ফজলুল হক, আলিবর্দি খাঁ, হিটলার, এঁরা সবাই সুবোধদার প্রতিবেশী, কেউই বিশ্বাসযোগ্য নন, সবাইকেই এড়িয়ে চলতে হবে।

একদিন সুবোধদাকে বললাম, 'আপনি নাকি বেহালা বাজান—কই, শোনাননি ত?' সুবোধদা তৎক্ষণাৎ বাড়ির ভেতর থেকে বেহালার বাক্সটি নিয়ে এলেন। 'কী শুনবেন, ইমন না বাগেশ্রী?'

বললাম, 'ইমনই হোক।'

'সা পা পাপ্পামা গা মা নিধানি···' সুবোধদা গুনগুন করে গতের মুখ ভেঁজে বেহালায় ছড় প্রয়োগ করলেন।

প্রায় আধঘন্টা এ-গৎ সে-গৎ বাজানোর পর সুবোধদা থামলেন। হাতের টিপ এখন তেমন না থাকলেও তিনি যে সঙ্গীতরসিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর পাগল হবার সূত্রপাতটিও সুবোধদা আমাদের কাছে একদিন বর্ণনা করেছিলেন।

'বসে আছি, বসে আছি, হঠাৎ চোখটা কেমন ধাঁধিয়ে গেলো। যেন একটা দিব্য জ্যোতি দেখলুম। আর তার পরেই দেখলুম তাঁকে—মা জগদম্বা। ছেকল শুদ্ধ টেনে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলেছেন—পরনে ডুরে শাড়ি, কোমর অবধি এলোচুল, পায়ে কেড্‌স জুতো।···ব্যস্‌, আমারও এদিকে ভোঁ।'

প্রায় পাঁচ বছর পর এই সেদিন আবার গিয়েছিলাম বোড়ালে কী জানি একটা কাজে। সুবোধদার বাড়ির সামনে গিয়ে ডাক দিতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। চেহারায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করলাম। কোথায় যেন একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব, আর সেই সঙ্গে একটা জৌলুসের অভাব। সেই চটের থলিও নেই, আর নেই কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ। দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললেন, 'আঁবের সময় এলে না ভাই, এবার আঁব হয়েছিল ভাল।'

এছাড়া আর বিশেষ কথা হয়নি। ফেরার সময় লোকমুখে জানলাম যে মাস ছয়েক হল আপনা থেকেই সুবোধদার মাথার ব্যামো সেরে গেছে।

[রমণীরঞ্জন সেন মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কাশীর ঘাটে। ১৯৫৭ সন, শীতকাল। আমরা 'অপরাজিতা' স্যুটিং-এর জন্য উপযুক্ত লোকজন খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর খুঁজছি সর্বজয়ার জ্যাঠামশাই ভবতারণ চাটুজ্যের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজন বৃদ্ধকে। ঠিক করেছিলাম সম্ভব হলে অপেশাদার অভিনেতা, কিংবা একেবারে অনভিনেতা নিয়েই কাজ করব।]

এক সন্ধ্যায় দশাশ্বমেধ ঘাটে কীর্তন শ্রোতাদের ভীড়ের মধ্যে রমণীরঞ্জনের দেখা পেলাম। ভবতারণের চেহারার যে ধাঁচটি কল্পনায় ছিল, বৃদ্ধের চেহারা দেখলাম তার খুবই কাছাকাছি। প্রথম দিনে এগোবার সাহস হল না। কথা নেই বার্তা নেই একজন

সপ্ততিপর নিরীহ কাশীবাসী বৃদ্ধকে গিয়ে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব করলে না জানি তার ফল কী হবে ! দ্বিতীয় দিনে আরো কিছু সাহস করে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেলাম। কীর্তনের আয়োজন চলছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই খোলে চাঁটি পড়বে। বৃদ্ধের সঙ্গে এই দ্বিতীয় দিনে আমার যা কথোপকথন হয় তার প্রায় অবিকল বর্ণনা নীচে দেওয়া গেলো—

আমি—নমস্কার ! কিছু মনে করবেন না। আমি, মানে, একজন পরিচালক। ফিল্ম পরিচালক। ছবি—ইয়ে, বায়োস্কোপ তৈরি করি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' উপন্যাসটি থেকে এখন একটা ছবি করছি। তাতে—মানে, এই বইটিতে, একটি কাশীবাসী বৃদ্ধের চরিত্র আছে। বেশ ভালো চরিত্র। চমৎকার। তাই—ব্যাপার হচ্ছে কি ফিল্মে যে সব সময় পেশাদারী অভিনেতার দরকার হয়, তা ত নয়। তাই ভাবছিলাম যে ধরুন, ওই পার্টটা যদি আপনি করেন···।

বৃদ্ধ—করুম না ক্যান ?

ব্যস্। ওই পর্যন্ত।

'করুম না ক্যান'-এর কোন উত্তর সেদিন বৃদ্ধকে দিতে পারিনি—বা দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিনি। পরে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে—না করার হাজার কারণ খুঁজে পাওয়া বৃদ্ধের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। বরঞ্চ করাটাই এক অভাবনীয় ব্যতিক্রম।

রমণীরঞ্জন যে কেন এক কথায় তাঁর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে সিনেমায় অভিনয় করার ঝক্কি পোয়াতে রাজী হলেন (পারিশ্রমিকের কথা আসে অনেক পরে) তা আজ অবধি বুঝতে পারিনি। আরো আশ্চর্য এই যে, বৃদ্ধ নাকি কোনদিন জীবনে সিনেমা দেখেননি, কোনদিন কোন শখের থিয়েটারে অভিনয় করেননি।

এক একজন অনভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করাতে বেশ বেগ পেতে হয় ; তার তুলনায় রমণীবাবুকে দিয়ে কাজ করানো ছিল সহজ। জড়তা বা ক্যামেরা-ভীতির কোন লক্ষণ তাঁর অভিনয়ে কখনো দেখিনি। বরঞ্চ সহ-অভিনেতার অক্ষমতা সম্পর্কে তাঁকে উদ্বিগ্ন হ'তে দেখেছি। একদিন সর্বজয়ার দাওয়াতে নৈশ ভোজনের দৃশ্য তোলা হবে। অপু (পিনাকী সেনগুপ্ত) ও ভবতারণ খাচ্ছেন, সর্বজয়া হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। ভবতারণ সংলাপ বলবেন, এবং কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপু গেলাস তুলে জলে চুমুক দেবে। রিহার্সাল নির্ভুল হওয়ায় এবার শট্ নেওয়া হবে। সব তৈরি। ক্যামেরা চলল, খাওয়া চলল, পাখার বাতাস চলল। ভবতারণকে সংকেত দিতে তাঁর সংলাপও চলল। কিন্তু হঠাৎ দেখি কথা শেষ করেই রমণীরঞ্জন তাঁর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে অপুর কোমরে একটা খোঁচা মারলেন।

আমি ত থ ! ক্যামেরা বন্ধ করে বললাম—'দাদু, ও কী করলেন, ওকে আঙুল দিয়ে অমন করলেন কেন ?'

দাদু বললেন—'অর জল খাওনের কথা না এইখানে ? পোলাপান, যদি ভুইলা যায় ?'

অন্যের অভিনয় সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও তাঁর নিজের কাজ সম্বন্ধে তিনি

ছিলেন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। কোন পেশাদারী অভিনেতাকে এতটা নিরুদ্বেগ হতে আমি কখনো দেখিনি।

'অপরাজিতা' ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁর সজাগ ঔৎসুক্য ছিল ; কাশীর কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে যাবার পরও মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে ছবির খবর নিতেন—'পালার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল জানাইয়া বাধিত করিবেন।' ফিল্মকে 'পালা' ছাড়া অন্য কোন শব্দে উল্লেখ করতে শুনিনি কখনো রমণীরঞ্জনকে।

রমণীবাবুর শেষ দিনের কাজে একটা রীতিমত কঠিন সংলাপের অংশ ছিল। কঠিন এই জন্যই যে কথাগুলো একটানা বলা চলে না। অসংলগ্ন চিন্তা টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্ত হবে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে উপযুক্ত ছেদ না থাকলে সব মাটি হয়ে যাবে। দৃশ্যটি সর্বজয়ার মৃত্যুর কিছুদিন পরের। অপু হাঁটুতে মুখ গুঁজে দাওয়ায় বসে কাঁদছে, ভবতারণ দাওয়ার অন্য প্রান্তে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে তামাক টানতে টানতে নাতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—কাঁদিস্ না অপু, কাঁদিস্ না। বাপ-মা কারো চিরকাল থাকে না। আমি বলছি, তুই আমার কাছেই থাক, থেকে পুজোআচ্চার কাজটাজগুলো আবার শুরু কর। আর পড়াশুনা করে কী লাভ ? তার চেয়ে বরং এখানেই থাক।'

প্রথম 'টেক'-এই তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বললেন রমণীরঞ্জন। দিনের শেষে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে সকৃতজ্ঞভাবে বললাম—'দাদু, আজ আপনার কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে।' দাদুর উত্তর আজও আমার কানে বাজে। আমার দিকে না ফিরেই ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে গম্ভীর গলায় বৃদ্ধ বললেন—'বলি, খারাপটা হইল কবে ?"

দেশ, শারদীয় ১৯৮২

একথা সেকথা
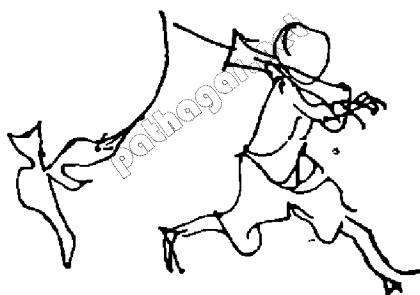
নতুন ছবির ভাবনা-চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় আমারই পুরনো ছবি সংক্রান্ত অনেক কথা মনে পড়ে যায়। এইসব টুকরো স্মৃতির অনেকগুলিই অভিনেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পেশাদারী, শৌখিন, আধা-শৌখিন, আধা-পেশাদারী, আবার একেবারে অনভিজ্ঞ আনকোরা নতুন—সব জাতের অভিনেতাই আছেন এদের মধ্যে। খ্যাতনামা পেশাদারী অভিনেতাদের অবলম্বন করে যে ঘটনা, তার সঙ্গে অখ্যাত অভিনেতাদের ঘটনার কিছুটা তফাত হতে বাধ্য। ঘটনা অনেক সময়ই তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয় ; অথবা অনেক ক্ষেত্রে যেটা মনে আছে সেটাকে ঘটনা আখ্যা দেওয়াই চলে না। কিন্তু যা মনে থেকে যায়, তার কিছুটা বিশেষত্ব আছে নিশ্চয়ই—এই বিশ্বাসেই আজ কয়েকটা পুরনো কথা বলব।

এমন অনেক অভিনেতা আছেন যাদের সঙ্গে একবার বৈ দু'বার কাজ করার সুযোগ আসেনি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আফসোস হয়েছিল চুনিবালা দেবীর ক্ষেত্রে। পথের পাঁচালির কাজ যখন চলছে, তখনই একদিন বিভূতিভূষণের একটি ছোটগল্পের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয় হয়। গল্পের নাম 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'। পরের দিনই চুনিবালা দেবীকে জানালাম যে ইন্দির ঠাকরুণের পরে তাঁকে আরেকটি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। দ্রবময়ীর কাহিনী শুনে চুনিবালা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় সুযোগটি আর কোনদিনও আসেনি। পথের পাঁচালি মুক্তি পাবার অল্প কয়েকদিন আগেই চুনিবালা কোমর ভেঙে শয্যা নেন। আর সেই যে শরীর ভাঙল—তারপর থেকে তাঁর পরলোকগমন পর্যন্ত আর কর্মক্ষমতা ফিরে আসেনি। দ্রবময়ীর কাহিনী বইয়ের পাতাতেই রয়ে গেল। চুনিবালার অভাব পূরণ করার মত অভিনেত্রী এদেশে আর আছে কি ? মনে হয় না।

অপরাজিত ছবিতে অপুর গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের ভূমিকায় যাঁকে নেওয়া হয়েছিল, তিনি আগে কোনদিন অভিনয় না করলেও সিনেমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অনেকদিনের। সুবোধ গাঙ্গুলী যুবা বয়সে নানান চিত্রগৃহে অপারেটরের কাজ করেছেন। অর্থাৎ, যে যন্ত্রের সাহায্যে ছবি দেখানো হয় সে-যন্ত্র চালানোর ভার ছিল তাঁর উপর। পরে ল্যাবরেটরির কাজ শিখে নিউ থিয়েটার্সের রসায়নাগারের অধ্যক্ষ হিসাবে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিউ থিয়েটার্সের স্বর্ণযুগে যে সব ছবি তৈরি হয়,

ফটোগ্রাফির ছিমছাম পারিপাট্য ছিল তাদের একটা বিশেষ গুণ, এবং এই গুণের জন্য কিছুটা প্রশংসা যে সুবোধ গাঙ্গুলীর প্রাপ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিউ থিয়েটার্সের পর ইনি অরোরা ল্যাবরেটরিতে যোগদান করেন। আমার সঙ্গে সুবোধ গাঙ্গুলীর পরিচয় অরোরা কোম্পানির আপিসেই। ভদ্রলোকের চেহারা এবং ঊনবিংশ শতাব্দী-সুলভ পোশাক-আশাক দেখেই তাঁকে আমি অপুর হেডমাস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব জানাই। ভদ্রলোক একগাল হেসে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'রোলটা বুঝি কমিক ? আমি কিন্তু আয়নায় চেহারা দেখে নিজেকে অনেক সময় চ্যাপলিন বলে কল্পনা করেছি।' ক্যামেরার সামনে অভিনেতারা সচরাচর নিজেদের অভিনয়ের দিকেই দৃষ্টি দেয ; কীভাবে ছবি তোলা হচ্ছে, ক্যামেরা কোথায় বসছে, আলো কোনদিক থেকে আসছে, এসব দিকে তাঁরা বিশেষ দৃষ্টি দেন না, বা দেবার কথাও নয়। সুবোধবাবু চলচ্চিত্র নির্মাণের খুঁটিনাটি এত বেশি করে জানতেন যে তিনি এসব দিকেও খেয়াল না করে পারতেন না। হয়ত শট্ নেবার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি তাঁকে খাতা হাতে দৃশ্যটা বোঝাচ্ছি, এমন সময় আমার কথার মাঝখানেই তিনি আমার ক্যামেরাম্যানকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, 'ও সুব্রতবাবু, আমার মুখে রিফ্লেক্টারটা কি ঠিক পড়েছে ? আপনি একটু আলোটা মেপে দেখুন তো। আমার মনে হয় ওটাকে একটু কাত করে দিলে বোধহয়...'

অপরাজিত-তেই আরেকটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন প্রৌঢ় অভিনেতাকে নেওয়া হয়েছিল। এঁকে আমি প্রথম ছবিতে দেখি দেবকী বসুর 'কবি'-তে রেল স্টেশনের বিহারী দারোয়ানের ভূমিকায়। ভদ্রলোক আসলে ছিলেন কমিক অভিনেতা। কালীঘাটের মন্দিরের কাছাকাছি কোথায় যেন থাকতেন। এমনিতেই পুরুত ঠাকুরের মতো চেহারা—আমার ছবিতে পার্টটাও পুরুতের—কাজেই চেহারার দিক দিয়ে বাছাইয়ে কোন ভুল ছিল না। ভদ্রলোককে আমাদের সঙ্গে কাশী যেতে হয়েছিল স্যুটিং-এর জন্যে। গঙ্গার ঘাটে আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা। রাত্রে আমরা চার পাঁচজনে দোতলার একটা ঘরে শুতাম, তার মধ্যে কালীবাবুও ছিলেন। ঘরের চারিদিকে দেয়ালে দেবদেবীর ছবি টাঙানো। সারাদিনের কাজের পর ক্লান্ত হয়ে রাত্রে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় একটা আলোর ঝলকানিতে প্রায়ই চোখ খুলে যেত, আর দেখতাম কালীবাবু মাটিতে শোয়া অবস্থাতেই জ্বলন্ত টর্চ হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটির পর একটি দেবদেবীর ছবির উপর আলো ফেলছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বিড় বিড় করছেন। কালীবাবুর স্মরণশক্তি তেমন প্রখর ছিল না, ফলে ডায়ালগ মুখস্থ রাখতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হত। শুধু তাই নয়—শট্ নেবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে এলেই তিনি খেঁকিয়ে উঠতেন—'আপনি আর বকবক করার সময় পেলেন না ? দেখছেন 'মুট' (mood) আনার চেষ্টা করছি !' এই 'মুট' আনা সত্ত্বেও তিনি কাশীর ঘাটে একবার একটি ডায়ালগে বারবার হোঁচট খেয়েছিলেন। কথাটা ছিল 'চাদরের খুঁটে চায়ের পাতা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।' সেটা যতবারই বলেন, হয়ে যায় 'চায়ের খুঁটে

চাদরের পাতা' কিংবা 'চায়ের পাতায় চাদরের খুঁট'। ঠিক কথাটা পেতে পেতে রোদ পড়ে গিয়ে স্যুটিং প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়।

পথের পাঁচালি আর অপরাজিততে যে পরিমাণ অপেশাদারী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অভিনেতাদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, তেমন অবিশ্যি আর কোন ছবিতেই হয়নি। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বোড়াল গ্রামের অধিবাসী। এঁদের অনেকের ক্ষেত্রে 'অপেশাদারী' কথাটাও প্রয়োগ করা চলে না—কারণ এমনও কিছু ছিলেন যাঁরা কোনদিনই কোনরকম অভিনয়ই করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যামেরার সামনে কাউকে তেমন কোন অসুবিধায় পড়তে দেখিনি। যা করতে বা বলতে বলেছি, তা সকলেই বেশ স্বাভাবিক ভাবেই করেছেন ও বলেছেন। এঁদেরই মধ্যে একজনকে অপরাজিতর একটি মাত্র দৃশ্যে ব্যবহার করে পরে আবার তিন কন্যার পোস্টমাস্টার ছবিতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় পার্টের প্রস্তাব জানাই। জানা ছিল যে এনার কিঞ্চিৎ গানের অভ্যাস আছে। গ্রাম্যবৃদ্ধদের আড্ডায় হারমোনিয়াম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে গান গাইতে হবে এঁকে। ভদ্রলোক নিজেই গান বেঁধে নিয়ে এলেন। বললেন, 'হারমোনিয়ামটা আমিই বাজাব।' তাঁর স্বরচিত গানটি শুনে দেখলাম তিনি সেটি আশাবরি রাগে বেঁধেছেন। বললাম, 'দাদু, আড্ডাটা যে সন্ধ্যাবেলায় বসছে, সেখানে কি ওই রাগ চলবে ?' ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মাত্র দশ মিনিট কসরৎ করে ওই একই গানকে পূরবী ঠাটে ঢেলে সাজিয়ে নিলেন। এই গান তিনি ক্যামেরার সামনে যে বিচিত্র ভাব ও বিচিত্র ভঙ্গিতে পরিবেষণ করলেন তাতে তিনি গায়ক হিসাবে না হলেও, অভিনেতা হিসেবে অনায়াসেই উচ্চ পংক্তিতে একেবারে পেশাদারীদের সমপর্যায়ে স্থান পেয়ে গেলেন। আসলে যাকে দিয়ে যে কাজটি স্বাভাবিক ভাবে হয়, ক্যামেরার সামনে তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারলেই সে কাজ উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে যায়। আমাদের দেশের ছবিতে অনেক দুর্বল অভিনয়ের কারণ হচ্ছে এই যে, যাকে দিয়ে যে কাজ হয় না তাকে দিয়ে ঠিক সেইটেই করিয়ে নেবার চেষ্টা।

অভিনয়ের তথা সংগীতের কথা বলতে গেলেই ছবি বিশ্বাসের কথা না বলে পারা যায় না। প্রথমটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সকলের কাছেই স্পষ্ট, দ্বিতীয়টির কথা কেন বললাম সেটা আমার বাকী কথা থেকেই পরিষ্কার হবে। ছবিবাবুর সঙ্গে আলাপ জলসাঘরের সূত্রে। জলসাঘরের কাজের জন্যেই মুর্শিদাবাদের নিমতিতা গ্রামের চৌধুরীবাড়িতে একাধিকবার বেশ কয়েকদিনের জন্য আমাদের একসঙ্গে থাকতে হয়েছিল। বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস ছাড়া আর কোন অভিনেতার কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কাস্টিং পর্বে যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, তখন বুঝলাম যে আর সবদিক দিয়ে আদর্শ নির্বাচন হলেও, দুটি ব্যাপারে সংশয়ের কারণ রয়ে যাচ্ছে। এক হল—তিনি কোনদিন ঘোড়ায় চড়েননি ; আর দ্বিতীয়—তিনি সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। 'সারে গামা জানেন ?' 'সন্দেহ আছে।' 'রাগরাগিণী ?' 'আদপেই না !' ঘোড়া চড়া যদি বা শিখিয়ে নেওয়া যায়, এ বয়সে সংগীতবোধ জাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি না হলেও, দুটোর কোনটাই আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অশ্বারোহণের দৃশ্যে

বিশ্বম্ভরের পোশাক পরিয়ে একটি 'ডাবল'-এর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই 'ডাবল'-এর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি নাকি কলকাতার তথা বাংলা দেশের সেরা 'স্টান্টম্যান'। কিন্তু ছবির শেষে ঘোড়া থেকে বালির উপর পড়ে যাওয়ার দৃশ্যে এই 'স্টান্টম্যান' যে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তার ফলে ভবিষ্যতের কোন ছবিতে বাংলা দেশের স্টান্টম্যান ব্যবহার করার বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল। একটি মাত্র আছাড়ের ফলেই আমাদের খাঁ সাহেবকে তিনদিনের জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল।

সংগীতের ব্যাপারটা অবিশ্যি এর চেয়ে অনেক ভালোই উতরেছিল। এমনকি একটি দৃশ্যে ছেলের গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এস্‌রাজের উপর ছড় ও অঙ্গুলি চালনা করতে হয়েছিল ছবিবাবুকে। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এই কঠিন পরীক্ষাতেও তিনি দিব্যি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

আরেকটি দৃশ্যে বিশ্বম্ভর রায় জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁর বাড়ির বারান্দায় একা বসে আছেন। অদূরে মহিম হালদারের বাড়ি থেকে খেয়াল সংগীতের রেশ ভেসে আসছে, বিশ্বম্ভর বিষণ্ণ তন্ময়তার সঙ্গে সে গান শুনছেন। বাঁ হাতে তাঁর ছড়িটি ধরা আছে, ডান হাতটা ছড়ির মাথায় উপর রাখা। দৃশ্যটি যখন তোলা হয়, তখন অবিশ্যি কোন সংগীত ব্যবহার করা হয়নি। আমি কেবল বলে দিয়েছিলাম—আপনি শুনতে শুনতে যে কোন একটা মুহূর্তে আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ছড়িটার উপর একটা মৃদু আঘাত করবেন—ব্যস্, তাহলেই আমার কার্যসিদ্ধি হবে। ছবির কাজের শেষ দিকে শব্দ সংযোজনার সময় এই মূক দৃশ্যে যখন খেয়াল গানটি জুড়ে দেওয়া হয়, তখন গানের একটি সম-এর সঙ্গে ছবিবাবুর তর্জনীর ওই আঘাতটি মিলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্বম্ভর যে গানের সমঝদার, সে বিষয়ে অন্তত সংগীতজ্ঞদের মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

এই ছবিবাবুই একদিন সংগীত সম্পর্কে হঠাৎ ভীষণ ভাবে সচেতন হয়ে পড়েন। সেও এই জলসাঘরের স্যুটিং-সত্ত্বেও নিমতিতার রাজবাড়ির প্রশস্ত বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি ঘরের একটিতে ছবিবাবু ও আরেকটিতে আমি থাকতাম। (আমার ঘরটিতে বসেই নাকি এককালে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা' রচনা করেছিলেন)। স্যুটিং চলত সকালে ও বিকালে। সন্ধ্যাবেলা থেকে ছবিবাবু তাঁর নিজের ঘরেই থাকতেন। যেদিনের ঘটনা, তার পরের দিন তোলা হবে রায়বাড়িতে উৎসবের দৃশ্য। তাতে গড়ের বাদ্যি বাজবে। তাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে ব্যাণ্ডপার্টি। রাত তখন হবে সাড়ে আটটা। আমি আমার ঘরে বসে ল্যাম্পের আলোয় চিত্রনাট্যের পাতা উলটোচ্ছি। এক তলায় বারান্দার সামনেই ব্যাণ্ডপার্টি মহড়া দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমি আমার জানলা থেকে এটা বাজাও সেটা বাজাও বলে নির্দেশ দিচ্ছি। হঠাৎ শুনি বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড হুঙ্কার—'মিস্টার রয়!'—ছবিবাবুর কণ্ঠস্বর! হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এসে দেখি ভদ্রলোক লুঙ্গি পরে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে ভারী বিরক্ত ও অস্থির ভাবে মাথা নাড়ছেন। আবছা অন্ধকারে আমায় দেখতে পেয়ে একটা হাত ব্যাণ্ড বাদকদের দিকে নির্দেশ করে পরম অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে কী?'

আমি বললাম, 'কাল যে বিশ্বম্ভরের বাড়ির উৎসবে ব্যাণ্ড বাজবে। তাই মহড়া দিচ্ছে আর কি।'

ভদ্রলোক গর্জিয়ে উঠলেন, 'ডু ইউ কল দিস এ ব্যাণ্ড ? না আছে তাল, না আছে স্পিরিট—হুঃ'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভালো ব্যাণ্ড আর কী করে পাবেন বলুন।'

ভদ্রলোক কোনো কথা শুনলেন না। 'দূর্—কিস্‌সু হসসেনা, কিস্‌সু হসসেনা!' তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'হোয়াই ডোন্‌চিউ কনডাক্ট ?'

ব্যাণ্ড-পরিচালনা জিনিসটা আমার অভ্যাসের বাইরে বলাতে ভদ্রলোক শেষটায় নিজেই রেলিং-এর উপর দিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে দু' হাত মাথার উপর তুলে কনডাক্ট করা শুরু করলেন ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড-শেয়াল-ঝিঁঝি সবকিছুর আওয়াজ ছাপিয়ে তারস্বরে চীৎকার—'ওয়ান টু থ্রী—ওয়ান টু থ্রী—'

দেশ, বিনোদন: ১৯৭০

রঙীন ছবি

অশনি সংকেত সম্পর্কে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, এ কাহিনীর জন্য আমি রঙ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম কেন। বিভূতিভূষণেরই রচনা গ্রামের পটভূমিকায় দারিদ্র্যের কাহিনী পথের পাঁচালি-তে তো রঙের প্রয়োজন হয়নি ; তবে এই দুর্ভিক্ষের কাহিনীতে রঙ কেন ? এ ধরনের প্রশ্ন থেকে চলচ্চিত্রের রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের ধারণার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধারণাটা সম্ভবত এই যে, রঙের সঙ্গে গ্ল্যামারের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, অতএব সমাজের নিম্নস্তরের গ্লানিকর জীবনের সার্থক প্রকাশ রঙে সম্ভব নয়। এ ধারণা অস্বাভাবিক নয়। মাত্র কয়েক বছর আগেও রঙ সম্বন্ধে এটাই ছিল প্রচলিত মত। যাঁরা চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে সিরিয়াস বিষয়বস্তুর সঙ্গে রঙ খাপ খায় না। বিদেশে অবিশ্যি আজ আর কেউ একথা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমাদের দেশে যারা কেবলমাত্র হিন্দি ছবিতে রঙ দেখেছেন, বা বিদেশী সিরিয়াস ছবিতে রঙের সংযত ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের মনে এখনো এমন ধারণা থাকা স্বাভাবিক। অশনি সংকেত ছবিতে কেন রঙ ব্যবহার করলাম, সেটা বলার আগে সাধারণভাবে রঙীন চলচ্চিত্র সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

বিশ দশকের শেষের দিকে ধ্বনি সংযোগের ফলে চলচ্চিত্রশিল্পে যে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল, সে কথা সকলেই জানে। নির্বাক চলচ্চিত্র যে একটা স্বতন্ত্র শিল্পরীতি ছিল সেটা ঠিক, কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, কাহিনী-বিন্যাসের ব্যাপারে নির্বাক ছবিকেও সময় সময় বাক্যের সাহায্য নিতে হত। এই বাক্যের ব্যবহার হত ছবির মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত টাইটেলে। কাহিনীর যে বক্তব্য ছবির সাহায্যে বোঝানো সম্ভব হত না, সেখানেই প্রয়োজন হত টাইটেলের। সবাক ছবিতে টাইটেলের পরিবর্তে এল সংলাপ। কাহিনী বা চরিত্র সম্পর্কিত যেসব তথ্য অভিনয় ও দৃশ্যগত অন্যান্য ডিটেলের সাহায্যে বলা গেল না, সেখানেই কথ্য ভাষায় সে কাজটা সমাধানের চেষ্টা শুরু হল। সংলাপ ও অভিনয়ের রীতি প্রথমে ছিল থিয়েটার-ঘেঁষা। ক্রমে তা আরো স্বাভাবিক হয়ে চলচ্চিত্রের একান্ত নিজস্ব ঢঙে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকৃত হল যে ধ্বনিসংযোগের ফলে চলচ্চিত্র বাস্তব

জীবনের আরো অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এরপরে এল রঙ। বাস্তব জীবনে বর্ণ ও ধ্বনি দুইই বর্তমান, এবং চলচ্চিত্র প্রধানত বাস্তব জীবন থেকেই তার উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যেমন নির্বাক যুগে চলচ্চিত্রে ধ্বনির অভাব নিয়ে কেউ আক্ষেপ করেনি, তেমনি সবাক যুগেও ছবিতে রঙ নেই বলে কেউ অনুযোগ করেনি। তা সত্ত্বেও টেকনোলজির তাগিদে রঙীন ছবির উদ্ভব হল। ১৯৩৫ সালে প্রথম তিন-রঙা কমার্শিয়াল ছবি Becky Sharp আত্মপ্রকাশ করল। রঙের অভিনবত্ব দর্শককে চমৎকৃত করলেও, ধ্বনিসংযোগও চলচ্চিত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছে, একথা কেউ মনে করেনি। এর কিছু পরে অবিশ্যি আইজেনস্টাইন প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা চলচ্চিত্রে বর্ণ প্রয়োগের নানান সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে সে আলোচনা সে সময়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। Becky Sharp-এর পর ক্রমে রঙীন ছবি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে যথারীতি সাদা-কালো ছবিরও উৎপাদন চলতে থাকে। যেটা কালক্রমে প্রায় একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল, সেটা হল এই—নৃত্যগীত সম্বলিত মিউজিক্যাল ছবি, জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহাসিক ছবি, ফ্যানটাসি ছবি, শিশুদের উপযোগী ছবি, হালকা প্রেমের হাসির ছবি, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত ছবি—এই সবের জন্য রঙ, এবং অন্যান্য সিরিয়াস ছবি, বা কড়া মেজাজের থ্রিলার বা গোয়েন্দা কাহিনীর জন্য সাদা-কালোর ব্যবহার। এটা ছিল হলিউডের নিয়ম। এ নিয়ম থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিরিয়াস ছবিতে যে রঙের ব্যবহার চলতে পারে, এটা হলিউডও তখন মানতে পারেনি। মাত্র বছর দশেক আগেও কিছু বিদেশী পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছিলাম যে রঙ জিনিসটাকে তাঁরা অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বিষয়বস্তুর পক্ষে উপযোগী বলেই মনে করেন। নির্বাক ছবির বিলুপ্তি তাঁরা মেনে নিলেও সবাক যুগে রঙীন ছবির আধিপত্যে সাদা-কালোর চিরনির্বাসন তাঁদের আদৌ কাম্য ছিল না।

আজ কিন্তু হলিউডের এই নিয়ম তথা এইসব বিদেশী পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পালটে গেছে। নির্বাক ছবির মতোই সাদা-কালো ছবি আজ বিদেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। এর প্রধান কারণ অবিশ্যি ব্যবসাগত। রঙীন ছবি তোলার খরচ ও ঝক্‌কি আজ আগের তুলনায় অনেক কম। দ্বিতীয়ত, সাধারণ দর্শক রঙ পছন্দ করে। তৃতীয়ত, টেলিভিশনে রঙের প্রচলনের পর থেকে রঙীন ছবির অর্থোপার্জনের একটা নতুন পথ খুলে গেছে। এইসব কারণে বিদেশী পরিচালকদের আজ প্রায় বাধ্য হয়েই রঙীন ছবি করতে হচ্ছে। এবং একই কারণে তাদের বাধ্য হয়েই রঙের শৈলীগত দিকটা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এই ভাবনার ফলে সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বর্ণসংযোগ চলচ্চিত্রের ভাষাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে এবং এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যার ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার অসঙ্গত। শুধু পরিচালক নয়, বিদেশের কোনো সমালোচকও আজ আর অমুক ছবিতে কেন রঙ ব্যবহার হল বলে অভিযোগ করেন না। রঙের প্রয়োগ শিল্পসম্মত হল কিনা এটাই এখন তাঁদের আলোচ্য বিষয়।

আসলে ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে যেমন ধ্বনির অপপ্রয়োগ সবাক চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা পেতে দেয়নি, তেমনি তার দশ বছর পরে রঙের অপব্যবহার রঙীন ছবিকে শিল্পের বিচারে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। রঙীন ছবির প্রথম যুগে রঙ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছিলেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল চলচ্চিত্রের সঙ্গে চিত্রকলার একটা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা। এই একই উদ্দেশ্যে সাদা-কালো ছবির ক্যামেরার কাজেও চিত্রকলাসুলভ chiarascuro বা আলোছায়ার সচেতন ব্যবহার দেখা যেতো। প্রথমদিকের রঙীন ছবিতে বর্ণপ্রয়োগের যে দিকটা লক্ষণীয় সেটা চিত্রকলার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কোর্ডা যখন রেমব্রান্টের জীবনী অবলম্বনে রঙীন ছবি তোলেন, তখন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ছবির দৃশ্যসজ্জায় রেমব্রান্টের সুপরিচিত প্রিয় রঙগুলি ব্যবহার করা। সাম্প্রতিককালে লোত্রেক বা ভ্যানগগের জীবনীচিত্রেও এই একই প্রবণতা দেখা যায়। শিল্পীজীবনী বাদ দিয়েও উদাহরণের অভাব হয় না। রুবেন ম্যামুলিয়ান রচিত Blood and Sand ছবির পটভূমিকা ছিল স্পেন। ম্যামুলিয়ান রঙের ব্যবহারে স্পেনীয় চিত্রকর ভেলাথকুয়েথের ছবিকে আদর্শ মেনে অনুসরণ করলেন।

এই সময় থেকেই রঙীন চিত্র নির্মাণের কাজে শিল্প নির্দেশক বা আর্ট ডিরেক্টরকে একটি নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। সেটা হল বর্ণবিশেষজ্ঞের ভূমিকা। তার কাজ হল কালার হারমনির নিয়ম মেনে আসবাবপত্র, পোষাকপরিচ্ছদ নির্বাচন করে দেওয়া, এবং ক্যামেরা শিল্পীর লক্ষ্য হল সুষ্ঠু আলোক প্রয়োগের সাহায্যে এইসব রঙের সদ্ব্যবহার করা। প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্য গ্রহণের সময়ও চিত্রকলার রঙ ও কম্পোজিশনের সাবেক নিয়মগুলো মেনে চলার চেষ্টা শুরু হল। বলা বাহুল্য, সে যুগের অনেক রঙীন ছবিই বর্ণপ্রয়োগে সুরুচির পরিচয় বহন করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে চলচ্চিত্র শিল্পের বিচারে রঙের এই প্রয়োগ সার্থক নয়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে চিত্রকলার একটা সম্পর্ক আছে ঠিকই। বিশেষত এক ধরনের চিত্রধর্মী ছবিতে (যেমন আইজেনস্টাইন বা ড্রায়ারের কিছু ছবি) এই সম্পর্কটা বিশেষভাবে প্রকট। কিন্তু শতকরা নব্বুই ভাগ ছবিতে ক্যামেরা বা দৃশ্যবস্তুর গতিশীলতা হেতু চিত্রকলার স্থির কম্পোজিশনের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। এইসব ছবির ক্ষেত্রে চিত্রকলাসুলভ রঙের ব্যবহার তাই নিরর্থক।

আসলে যে উপলব্ধিটার প্রয়োজন ছিল সেটা হল এই যে রঙকে যদি চিত্রভাষার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবেই সেটা রঙের সার্থক প্রয়োগ হয়। কেবলমাত্র সুরুচির পরিচয় বহন করায় রঙের কোনো সার্থকতা নেই। কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণন, নাট্যরস ও মুড সৃষ্টি, বা এমনকি নিছক তথ্য পরিবেষণেও যে রঙ একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম রঙের শিল্পসম্মত প্রয়োগের শুরু। আজ যে বিদেশের পরিচালকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রঙীন ছবির কাজে নেমেছেন তার মূলেও রয়েছে এই উপলব্ধি।

চিত্রপরিচালক হাতে তথ্য পরিবেষণের যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে

দুর্বলতম হল কথা। দৃশ্য বা ধ্বনির সাহায্যে কাজ না হলেই চিত্রনাট্যকার তথা পরিচালক কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্তত সার্থক চলচ্চিত্রের এই নিয়ম। চীনাদের সেই উক্তি—'এক ছবি হাজার কথার সামিল'—চলচ্চিত্রকারকে তাই মনে রাখতে হয়। শক্তিমান পরিচালকের প্রধান গুণ হল বাক্যের সাহায্য না নিয়েও দৃশ্যকে বাঙ্ময় করে তোলা। একাজে ক্যামেরা অভিনয় দৃশ্যগত ডিটেল সম্পাদনা ইত্যাদি সবকিছুই প্রয়োজনে আসতে পারে। আর পারে রঙ।

রঙের কথা বলার আগে সাদা-কালোর অক্ষমতার কয়েকটা উদাহরণ দিই। সাদা-কালো ফটোগ্রাফিতে সাদা রঙ ও অন্য হাল্কা রঙের মধ্যে, বা কালো রঙ ও অন্য গাঢ় রঙের মধ্যে কোন তফাত করা প্রায় অসম্ভব। মনে পড়ে কোনো এক সমালোচক পথের পাঁচালিতে রাণুর বিবাহ সংক্রান্ত একটি দৃশ্যে 'আয়ুর্বৃদ্ধান্নে কালো শাড়ি' কেন ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। শাড়িটি আসলে ছিল লাল। সোনা-রূপা-তামা-কাঁসা-অ্যালুমিনিয়মের মধ্যেও কোনো তফাত করা সাদা-কালোয় সম্ভব নয়। অথচ গহনা, আসবাব, তৈজসপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য কাহিনী বিন্যাসের কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারে। সিঁথের সিঁদুর রঙ ছাড়া ছবিতে ধরা পড়ে না। পায়ের আলতা হয়ে যায় কালো। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি তার বিশেষ ব্যঞ্জনাটি হারিয়ে ফেলে। গ্রাম্য প্রকৃতির নানান সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ডিটেল—যার প্রতি বিভূতিভূষণ বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—রঙ ছাড়া ছবিতে ধরা পড়ে না। মেঘমুক্ত আকাশের রঙ প্রহরে প্রহরে বদলায়। কখনো বা গাঢ় নীল, কখনো বা ফিকে, কখনো বা নীলের লেশটুকু চলে গিয়ে স্বচ্ছ সাদা, আবার সকাল-সন্ধ্যায় হলুদ, লাল, কমলা, বেগুনীর আভাস। প্রতিটি অবস্থার মুড স্বতন্ত্র, প্রতিটি অবস্থা ছবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম। কিন্তু এটা সম্ভব একমাত্র রঙে।

চরিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুলতেও যে রঙ সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক চরিত্রের সঙ্গে আরেক চরিত্রের শ্রেণীগত পার্থক্য সাধারণভাবে সাদা-কালোয় ফোটানো কঠিন নয়, কিন্তু রঙে সে কাজটা হয় আরো অনেক সহজে, আরো অনেক তীক্ষ্ণভাবে। এখানেও রঙের তথ্যবহন ক্ষমতাটাই কাজে লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির আট ন'টি প্রধান চরিত্রের পোষাক নির্বাচনে সেইসব চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত রুচি, মানসিক অবস্থা—এ সবকিছুরই ইঙ্গিত দেবার প্রয়াস ছিল। সাদা-কালোয় এ কাজটা সম্ভব হত আংশিকভাবে, বাকিটুকু হয় অব্যক্ত থেকে যেত, না হয় সংলাপের সাহায্যে বলতে হত।

নাট্যরস সৃষ্টির ব্যাপারেও রঙ একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। চিত্রকর রুচির কথা চিন্তা করে চিত্রপটে রঙে রঙে যে ধরনের সংঘাত পরিহার করেন, চলচ্চিত্রে এই সংঘাত পরিচালক চমৎকারভাবে নাটকের কাজে প্রয়োগ করতে পারেন।

এরই বিপরীতে রয়েছে রঙের সংযত প্রয়োগ। এখানে বক্তব্যের তাগিদেই রঙ স্নিগ্ধ, প্রশমিত, এবং দর্শকও সাময়িকভাবে বিস্মৃত যে, সে রঙীন ছবি দেখছে।

অবিশ্যি এই রঙেরই অমিত প্রয়োগে যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে,

আজকের যে কোনো হিন্দি ছবিতেই তার প্রমাণ মিলবে। হিন্দি ছবিতে রঙের ব্যবহার গ্ল্যামারের উদ্দেশ্যে। বিষয়বস্তুর দৈন্য গোপন করার জন্যই এই বহুবর্ণ মোড়কের প্রয়োজন। গ্ল্যামারের কথা চিন্তা করেই হিন্দি ছবির প্রযোজক প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্য গ্রহণের কাজটা ঝলমলে রোদে ছাড়া করেন না। অথচ মেঘলা দিনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য চমৎকারভাবে রঙীন ছবিতে প্রকাশ করা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, দার্জিলিঙে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির দৃশ্য গ্রহণকালে সেই একই সময়ে একই জায়গায় একটি হিন্দি ছবির শুটিং-এর কথা। নভেম্বর মাসের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে কাঞ্চনজঙ্ঘার চিত্রনাট্যে মেঘ, রোদ, কুয়াশা সব রকম অবস্থার উপযোগী দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। হিন্দি পরিচালক তুলছিলেন একটি গানের দৃশ্য। ছাব্বিশ দিন শুটিং-এ দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার সদ্ব্যবহার করে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাজ শেষ হল, আর এই ছাব্বিশ দিন ধরে কেবলমাত্র রোদের আশায় বসে থেকে এই একটি মাত্র গানের শুটিং-ও শেষ করতে পারলেন না হিন্দি ছবির পরিচালক।

অশনি সংকেতের দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে আজ আমার বিশ্বাস হয়েছে যে রঙ জিনিসটা সব রকম বিষয়বস্তুর পক্ষেই উপযোগী। ছবির অন্যান্য উপাদানের মতোই রঙের প্রধান কাজও হল কথা বলা, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, বা মূল বক্তব্যকে ব্যাহত করে নয়। বিষয়বস্তু দারিদ্র্য সংক্রান্ত না সচ্ছলতা সংক্রান্ত সেটা কোনো প্রশ্নই নয়, কারণ দারিদ্র্যেরও বিশেষ রঙ আছে, যেমন সচ্ছলতারও আছে। আর ধ্বনির মতো রঙও তো বাস্তব জীবনের একটা অঙ্গ। সুতরাং চলচ্চিত্রে ধ্বনির ব্যবহার যেমন সঙ্গত, রঙও তেমন হবে না কেন, তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

দেশ, বিনোদন; ১৯৭২

বিনোদদা
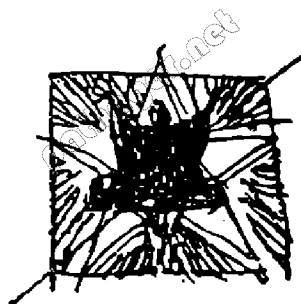
১৯৪০ সালের আগে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে চিনতাম না। তাঁর নামেও না কাজেও না। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রবাসী-র পাতায় বিনোদবিহারীর আঁকা ছবি কখনো চোখে পড়েনি।

কলেজে পড়া শেষ করে আমি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে গিয়ে কাটিয়ে আসি এমন একটা ইচ্ছা আমার মা প্রায়ই প্রকাশ করতেন। ছবি আঁকার লাইনেই যাবো—হয়ত কমার্শিয়াল আর্ট করব—এটা আমার নিজেরও আশা ছিল। শান্তিনিকেতনে কমার্শিয়াল আর্ট শেখানো হয় না, সেখানে হয় ওরিয়েন্টাল আর্ট। ওরিয়েন্টাল আর্ট বলতে বুঝতাম প্রবাসীর প্রথম পাতার রঙীন ছবি। এইসব তিন-রঙা হাফটোন আর্টপ্লেটের মধ্যে এক নন্দলাল বসু ছাড়া আর কারুর ছবি তেমন আমল দেবার যোগ্য বলে মনে হয়নি। ওয়শ পেন্টিং জিনিসটা জোলো বলে মনে হত, ছবির বিষয়বস্তু ও অঙ্কণরীতিতে একটা পেলব ভাবালুতার ইঙ্গিতে মন বিরোধী হয়ে উঠত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এদেশে কমার্শিয়াল আর্ট করতে গেলে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা দরকার, এই বিশ্বাসে কলাভবনে গিয়ে হাজির হই।

আশ্রমে পৌঁছানর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাঁর ছবি প্রথম চোখে পড়ল তিনি হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। কলাভবন হোস্টেলে একটি তিন-কামরা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রাবাসে আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়ির সামনের বারান্দায় পা দিতেই দৃষ্টি আপনা থেকে উপর দিকে চলে গেল। সারা সিলিং জুড়ে একটি ছবি। গাছপালা মাঠ পুকুর মানুষ পাখি জানোয়ারে পরিপূর্ণ একটি স্নিগ্ধ অথচ বর্ণোজ্জ্বল গ্রাম্য দৃশ্য। বীরভূমের গ্রাম। দৃশ্য না বলে ট্যাপেস্ট্রি বলাই ভালো। অথবা এনসাইক্লোপিডিয়া। এ ছবি এমনই ছবি, যার সম্বন্ধে ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পর্কে আমার মন-বিমোণ কোনো সংজ্ঞাই প্রয়োগ করা চলে না।

আড়াই বছর শান্তিনিকেতনে থেকে বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। শিল্পজগতে তাঁর একাকীত্বের চেহারাটাই ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নব্য ভারতীয় শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর একনিষ্ঠ মননশীলতা,

চিত্রশিল্পের রীতিনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

১৯৫০ সালের সাতই পৌষের মেলা দেখতে গিয়ে বিনোদদা'র সাম্প্রতিকতম শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতের মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের জীবনকে কেন্দ্র করে হিন্দি ভবনের তিনটি দেয়ালে আঁকা মিউর‍্যাল। বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশে এর চেয়ে মহৎ ও সার্থক কোনো শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিনোদবিহারীর কাজের সঙ্গে অপরিচিত কোনো প্রকৃত শিল্পরসিক যদি কেউ থেকে থাকেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেন অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এই মিউর‍্যালটি দেখে আসেন।

বিনোদবিহারীর শিল্পের বিচার আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি ছবি তুলতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। তারই কিছুটা অংশ আমি পাঠক সাধারণের সামনে উপস্থিত করতে চাই। শিল্পজগতের সঙ্গে যাদের পরিচয় সামান্য, তারা হয়ত জানেন না যে, বিনোদবিহারী গত পনর বছর যাবৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিরহিত। একটি চোখ নষ্ট অবস্থাতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল, অন্যটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পুরু কাঁচের চশমা পরতে হত তাঁকে। চিত্রপটের এক বিঘত দূরে চোখ রেখে ছবি দেখতে এবং আঁকতে হত। তিনি কলাভবনের অন্যতম অধ্যাপক হিসাবে এখন শান্তিনিকেতনেই আছেন। কলাভবনের কাছেই তাঁর অনাড়ম্বর বাসস্থান। অন্ধ অবস্থাতেই তিনি কিছুদিন হল একটি নতুন মিউর‍্যালের পরিকল্পনা করেছেন। সকালে দু' ঘণ্টা সময় তিনি এই মিউর‍্যালের কাজে ব্যয় করেন। দুপুরটা তাঁর বিশ্রামের সময়। এই সময়টা তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বেতের চেয়ারে বসেন। চোখে কালো চশমা, সামনে বেতের টেবিলের উপর তাঁর সিগারেট, দেশলাই ও ছাইদান। মেঝেতে দু' পায়ের মাঝখানে একটি ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। তার মধ্যে কাত করে রাখা ফ্লাস্কে ভরা raw tea। আমার সঙ্গে কথা হয় দুপুরেই। কথার ফাঁকে ফাঁকে ধূমপান ও চা দুইই চলতে থাকে....

"আমার জন্ম হয় বেহালাতে, আমার মাতুলালয়ে, ১৯০৩ সালে। আমাদের আদিনিবাস হল গরলগাছা। তোমাদের সিনেমা অ্যাকটর শৈলেনের বাবা ইন্দু মুখুজ্যে ছিলেন আমার জ্যাঠতুতো ভাই। তেরো বছর বয়স অবধি আমি কলকাতাতেই ছিলুম। নর্থ ক্যালকাটা। সেসব অলিগলি এখনো সেরকম আছে কি ? না চেঞ্জ করে গেছে ? কেষ্টদাস পালের স্ট্যাচু আছে এখনো ? ওই স্ট্যাচুর তলায় ছবির এগজিবিশন হত। ছোট ছোট অয়েল পেণ্টিং। ল্যাণ্ডস্কেপ। বাঙালী পেণ্টারের আঁকা। আমার দাদা বিজনবিহারীর সঙ্গে দেখতে যেতুম। শিল্পী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বেশ লোক। যাকে বলে স্বাধীনচেতা। বলতেন, এটা আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট—এই এগজিবিশন। দেখি লোকের কি রকম লাগে। দাদার খুব ছবি আঁকায় উৎসাহ ছিল। একবার ওই আর্টিস্ট ভদ্রলোককে Palette knife-এর কাজ সম্বন্ধে জিগ্যেস করলেন। ভদ্রলোক বললেন, ওসব জানিটানি না। আমি খুব সাধারণ আর্টিস্ট। অতশত বুঝি না।

"আমাদের ফ্যামিলি ছিল সংস্কারমুক্ত, ঈষৎ ব্রাহ্মভাবাপন্ন। মা পুজোআচ্চা

করতেন ঠিকই কিন্তু কোনো গোঁড়ামি ছিল না। আমার একমাত্র দিদি বিধবা হন। তারপর তার আবার বিয়ে হয়। সেটা ছিল বাংলাদেশের ফোর্থ বিধবা বিবাহ। ছবি আঁকতে পারতো বাড়ির প্রায় সকলেই। ইনবর্ণ। ছ'ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলাম আমি। মেজদা বনবিহারীর নাম তো শুনেছ। তখনকার দিনে কার্টুনিস্ট হিসাবে খুব নাম ছিল। ভারতবর্ষে তাঁর আঁকা বেরুত। আর শনিবারের চিঠিতে। এছাড়া আরো অনেক গুণ ছিল তার। বেশি লোকে জানে না। আমার উপর তার একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল।

"ছেলেবেলায় দেখা তিনখানা ছবির কথা খুব মনে আছে। আমাদের বাড়িতেই দেয়ালে টাঙানো থাকত। দুটো পৌরাণিক ছবি—আর্টিস্ট বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা কলঙ্ক ভঞ্জন, আরেকটা দুর্বাসার অভিশাপ। আর আরেকটা—সেটা বিলিতি—তার টাইটেল ছিল Absence makes the heart grow fonder। তখন ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে কিছু জানতুম না। ছবি দেখতুম, ভালো লাগত—অবনীন্দ্রনাথ, সুবোধ গাঙ্গুলী, সুখলতা রাও, উপেন্দ্রকিশোর রায়ের। উপেন্দ্রকিশোরের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির বাইরে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকত। ভেতরে কোরাস গান হচ্ছে, বেহালা বাজছে, তাই শোনার জন্য।"

"বাবা বিজনবিহারীকে একটা খাতা কিনে দিয়েছিলেন। তিনি তাতে কলকাতার অনেক স্কেচ করেছিলেন। সেটা আমার খুব ফেভারিট খাতা ছিল। ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে যাবার সময় নিয়ে যাবো, কিন্তু সবাই বারণ করলে। বললে, ওসব বিলিতি কায়দায় আঁকা ছবি, শান্তিনিকেতনে নেওয়া ঠিক হবে না। ওই যে বলত না—টুইলের সার্ট পরে নাকি ইণ্ডিয়ান আর্ট হয় না—এও সেই রকম আর কি।"

"আমার শান্তিনিকেতনে যাবার মূলে ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। শান্তিদেবের বাবা। দাদার সঙ্গে আলাপ ছিল। বললেন, তোমার এই ভাইটিকে গুরুদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দিও। আমি ততদিনে তিন চারটে ইস্কুলে পড়ে ফেলেছি। স্যান্‌স্‌ক্রিট কলেজিয়েট স্কুল, মডার্ন ইনষ্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল ; চোখের জন্য পড়াশুনা তেমন হচ্ছিল না। অনেক ওষুধপত্তর চিকিৎসা করেও চোখটার কিছু করা যায়নি। শশী সেন ডাক্তার বলেছিলেন, ও আঁকতে চায় তো আঁকাই শেখান, পাঁচ রকম কাজ না করাই ভাল। শেষটায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হলুম। কালীমোহন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। আমার চোখের কথা তাঁকে আগেই বলা হয়েছিল। দেহলীতে পৌছে কালীমোহন বললেন, যাও, জুতোটা বাইরে খুলে রেখে ভেতরে যাও। গেলুম। রবীন্দ্রনাথ দেখেটেখে বললেন, চোখের জন্য চিকিৎসা হয়েছে ? কোনো ফল হয়নি তাতে ? আমি মাথা নাড়লুম। বললেন, আশ্রমে সব কাজটাজ নিজে করতে হয় জান তো ? তুমি পারবে ? আমি বললুম পারব। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি কালীমোহনের সঙ্গে কথা বলছি। ভয় ছিল উনি হয়ত না বলে বসবেন, কিন্তু সেটা হল না।

"আমার চোখ খারাপ বলে একটি কাজ থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল ; ঘর ঝাঁট দিতে হত না। জগদানন্দ রায় সেটা জানতে পেরে বলেছিলেন, ছবিই যখন আঁকছে তখন ঘর ঝাঁট দেবে না কেন ? এই জগদানন্দ রায়ের বইয়ের জন্য

পোকামাকড়ের ছবি আঁকাই হল শিল্পী হিসেবে আমার প্রথম কাজ।"

"তখনকার দিনে যারা ইণ্ডিয়ান আর্ট করতেন তাঁদের পৌরাণিক ছবির দিকে একটা ঝোঁক ছিল দেখা যায়। আপনি কি সে ধরনের ছবি বড় একটা এঁকেছেন ?"

"একদমই না। মিথলজিতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। এর জন্যে আমার বাড়ির আবহাওয়াই দায়ী। ও ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। আমাদের বাড়িতে ছেলেবেলায় শুনেছি চেঁচিয়ে গোরা পড়া হচ্ছে, সবাই শুনছে। কাজেই বুঝতেই পারছ।"

* * *

"আমি অবশ্য তোমার ফিল্ম দেখিনি। ছেলেবেলায় চ্যাপলিন দেখেছি, খুব ভালো লাগত মনে আছে। লোকে এখনো চ্যাপলিন দেখে ?"

"আবার নতুন করে দেখছে, নতুন করে ভালো লাগছে।"

"বাঃ। চ্যাপলিন চমৎকার।...অবিশ্যি তোমার ছবির সমালোচনা কিছু কিছু পড়েছি। আর লোকে ছবি দেখে এসে বলেছে মাঝে মাঝে। সেই অপুর সংসার। একজন এসে বললে, ছবি ভালো হয়েছে, তবে সত্যজিৎবাবু এক জায়গায় একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলেছেন। কি রকম ? না, অপুর শালা এসে খবর দিচ্ছে তার স্ত্রী প্রসব হতে মারা গেছে, আর তাই শুনে কথা নেই বার্তা নেই, অপু ধাঁ করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে। আমি শুনে বললুম, ব্যাপারটা আমার কাছে অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে। আসলে কী জান, deeper truth জিনিসটা অনেকেই মানতে চায় না, না হয় বুঝতেই পারে না। অমুকের কথা জানতে—যার উপর দিয়ে একটার পর একটা আত্মীয়বিয়োগের ঝড় বয়ে গেস্‌ল। শেষটায় তার নিজের একটি সন্তানের মৃত্যুসংবাদ যখন তাকে দেওয়া হল, মহিলাটি বললেন—দূর, আর কত কাঁদব। এ জিনিস ফিল্মে চলবে কি ? বোধহয় না। কন্ট্রোভার্সি হয়ে যাবে।

"আমার মনে হয় অনেক জিনিস শিল্পী বা সমালোচকদের চেয়ে সাধারণ লোক তাদের সহজ বুদ্ধিতে বোঝে বেশি। আগে শান্তিনিকেতনে যখন আমরা বাইরে বসে ছবিটবি আঁকতুম, তখন সাঁওতালরা এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। একবার মনে আছে, এক পাল মোষের ছবি এঁকেছি। কতগুলো সাঁওতাল মেয়ে এসেছে, তাদের একজন ছবিটা দেখে বলল—এতোগুলো কেড়া (মহিষ) দিলি, আর একটা বাচ্চা দিলি না ? এই এক মন্তব্যে ছবিটার একটা বড় ত্রুটি বাতলে দিল। আজকাল অবিশ্যি কোনো সাঁওতাল এসে ছবি দেখে না। তারাও বদলে গেছে। খেতখামার ছেড়ে কারখানায় কাজ করে তাদের মন পালটে গেছে। প্রিমিটিভ আর্টও আর আগের মতো সম্ভব নয়। অনুভূতি আর অনুভূতির প্রকাশ-এর মধ্যে অনেক বাধা এসে পড়েছে। আগে সেগুলো ছিল না। প্রিমিটিভ শিল্পী ছবি আঁকতে চাইলে টেকনিক আপনা থেকেই এসে পড়ত। আজকে চর্চা করে টেকনিক শিখতে হয়। অনেক কাঠখড় না পোড়ালে কলাকৌশলে সোফিসটিকেশন আসে না। অথচ আলতামিরার ঘোড়া দেখ। গুহার মানুষকে তো আর আজকের হিসেবে সোফিস্টিকেটেড বলা যায় না। কিন্তু বুনো লোকেরাও পাথরের এমন ঘোড়া এঁকেছে যার কাছে চীনে ঘোড়া হার মেনে যায়। মানুষের এই স্বাভাবিক ক্ষমতাটা

ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

* * *

"ফিল্মে Blindness দেখানো হয়েছে?" বিনোদদা জিগ্যেস করলেন।

বললাম, "তা হয়েছে বই কি। বাংলা ছবিতেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' তো ছবি হয়েছে এককালে। ওদেশে আঁদ্রে জিদের উপন্যাস থেকে করা 'La Symphonie Pastorale' ছবির কথা মনে আছে..."

"কি রকম অন্ধ দেখায়? ঠিক জিনিসটা দেখায়?"

"যেমন বোবা দেখায়, অন্ধও তেমনিই দেখায় আর কি। বেশ খানিকটা মোলায়েম করে দেখানো হয়। বিশেষ করে স্বয়ং নায়িকা যদি বোবা বা অন্ধ হন তাহলে তো কথাই নেই। বোবার ভাষা প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টা থেকে যে গোঙানির উদ্ভব হয়, সেটা কোনো ছবিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

"তাহলে অন্ধের বেলাও হয়ত সহজ করে নেয়। আসলে ব্যাপারটা খুবই কম্‌প্লেক্স। এটা তো আগে জানা সম্ভব ছিল না। Space সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা হয়। Space টা হয়ে যায় একটা ঘন বস্তু—যেটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। যে জিনিসটা স্পর্শ করছি সেটা ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকে না। তোমরা চেয়ার দেখলেই বুঝতে পারছ সেটা আছে, আমি চেয়ারে বসলে পরে তবে বুঝছি সেটা আছে। তাও তাতে হাতল আছে কিনা সেটা হাতলে হাত না ঠেকা পর্যন্ত বুঝছি না। তারপর হাতলটা কাঠের না বেতের, সরু না মোটা, পালিশ করা না এবড়োখেবড়ো, সেটা গোল হয়ে নেমেছে না রাইট অ্যাঙ্গলে নামছে, এসব হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে তবে বুঝতে হবে। অপ্রত্যাশিত কিছু হাতে ঠেকলে চমকে উঠতে হয়। এই যে চেয়ারে বসে আছি, লাঠিটা আমার সামনে হাতলের উপর আড়ভাবে রাখা আছে—যদি লাঠিটার কথা ভুলে যাই, তাহলে সেটা হাতে ঠেকলেই শিউরে উঠি। এছাড়া আবার আরেকটা দিকও আছে। এই যে চায়ের গেলাসটা হাতে নিলুম—কাঁচ জিনিসটার স্পর্শগত অনুভূতি কোনোদিন আগে এভাবে Feel করিনি। এরকম সব বস্তু সম্পর্কেই একটা tactile feeling গড়ে ওঠে।"

"আপনি ত স্কেচ করেন এখনো।"

"আজকাল আর বিশেষ করি না। প্রথম দিকে করেছি। পৃথ্বীশ Flowmaster কলম এনে দিয়েছিল কয়েকটা। কিন্তু অসুবিধেও আছে। কখন কালি ফুরিয়ে যায় টের তো পাই না। আঁকছি আঁকছি, কেউ হয়ত হঠাৎ দেখে বলল—ওকি, আপনার কাগজে যে দাগ পড়ছে না। তাই আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। রঙের ব্যাপারেও ইন্টারেস্ট চলে যাচ্ছে। আগে রঙীন কাগজের টুকরো কেটে collage করতুম, কিন্তু এখন ক্রমে বুঝতে পারছি রঙে exact shade মুখে বলে বোঝানো যায় না। অমুক জিনিসের মত নীল, অমুক ফুলের মতো লাল—এই রকম বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতেও প্রিসিশন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত একটা সংশয় থেকে যায়। এখনো যে ইন্টারেস্টটা রয়ে গেছে সেটা হল ফর্ম সম্পর্কে। আর টেনশন। যে মিউর্যালটা করছি তাতেও ওই পাশাপাশি মানুষের figure গুলোর মধ্যে

পারস্পরিক টেনশন, সমগ্র কম্পোজিশনের টেনশন। এটাই হল বড় কথা।"

"আবার সেই সাধারণ মানুষ।"

"হ্যাঁ। সবই আমার দেখা জিনিস, জানা জিনিস। দেখলে তো--চানাচুরওয়ালা, কাঁধে বাঁক নিয়ে যাচ্ছে লোক, মেয়ের মাথায় ঝুড়ি, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী—সব নিজের চোখে দেখা সাধারণ ব্যাপার। ওসব অ্যাবস্ট্র্যাকশন-এর যান্ত্রিক ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বাড়ির বাইরে থাকবে মিউর‍্যাল, সামনে দিয়ে লোক চলাচল করবে, দেখে অন্তত বুঝতে পারবে এগুলো মানুষ।"...

* * *

"তোমার ফিল্মে খোয়াই দেখাবে তো?"

"ইচ্ছে তো ছিল—কিন্তু খোয়াই তো সব উধাও হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"একটা জায়গায় আছে এখনো। তালতোড়। প্রান্তিক স্টেশনের দিকটায়। আর আছে চীপ সাহেবের কুঠির দিকে। খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই, আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার—ওটাই আমি।"

দেশ, বিনোদন: ১৯৭১

শতাব্দীর সিকি ভাগ

পথের পাঁচালি করার পরে এই পঁচিশ বছরে আমি চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে নতুন কী জ্ঞান লাভ করেছি, এবং সেটা কীভাবে আমার পরবর্তীকালের ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সে কথা আমাকে অনেকে অনেক সময় জিগ্যেস করেছিল। এই প্রশ্নের পিছনে হয়ত এমনও একটা ইঙ্গিত ছিল যে, পথের পাঁচালির মতো এত খ্যাতি, এত প্রশংসা, এত পুরস্কার যখন আমার আর কোনো ছবিই পায়নি, তখন চলচ্চিত্রকার হিসাবে সত্যিই কি এই পঁচিশ বছরে আমার কোনো উন্নতি হয়েছে?

এর এক কথায় উত্তর হল—অবশ্যই হয়েছে, এবং তার প্রমাণ আছে আমার পরের দিকের অনেক ছবিতেই। আমি জানি এ উত্তর অনেকেই মানবেন না। পথের পাঁচালি-র প্রধান গুণ ছিল তার সরলতা। তার সঙ্গে আবেগ, কাব্যময়তা, বাস্তবানুগত্য, মানবিকতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ—যার সবই বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বর্তমান—সে ছবিকে দর্শকের মনে এমনই একটা স্থান করে দিয়েছে যেখান থেকে আর তাকে সরানো চলে না।

সত্যি বলতে কি, শুধু হৃদয়ের উপর প্রভাব দিয়েই যদি ছবির উৎকর্ষের বিচার হত, তাহলে পথের পাঁচালি অবশ্যই হত এই পঁচিশ বছরে আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু ছবির বিচার শুধু এই একটি গুণের উপর হয় না। আমি জানি পথের পাঁচালির অনেক অংশে চিত্রভাষাগত এমন সব দুর্বলতা আছে যেগুলোর একমাত্র কারণ ছিল আমার অনভিজ্ঞতা। সৌভাগ্যক্রমে এই সব দুর্বল অংশের বেশির ভাগই ছবির গোড়ার দিকে। ছবিটি তোলা হয়েছিল মোটামুটি কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করে—অর্থাৎ গোড়ার দৃশ্যগুলি গোড়ায় এবং পরের দিকেরগুলি পরে। দুই অংশের কাজের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল অনেক। পথের পাঁচালি ছবি তৈরি করতে আড়াই বছর লেগেছিল শুনে অনেকে সহানুভূতিসূচক আক্ষেপোক্তি করেন, কিন্তু আমরা জানি যে যে সময়টা অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ থাকত, সেটা ছিল আমাদের শিক্ষানবিশীর সময়; যতদূর কাজ হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভবিষ্যতের কাজ যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতাম আমরা।

প্রধানত সহজ করে বলার দিকে লক্ষ্য রাখলেও, সেই পঁচিশ বছর আগেই একটা

জিনিস আমি খুব সচেতনভাবেই চেষ্টা করেছিলাম, সেটা হল ছবির সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলিতে সংলাপ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা। বলা বাহুল্য, এই সব মুহূর্তগুলির সব ক'টিই মূল উপন্যাস থেকে নেওয়া। বিভূতিভূষণ এই সব মুহূর্তগুলিকে কাব্যময় করে তুলেছিলেন তাঁর ভাষার ব্যবহারে। চলচ্চিত্রকারকে সেখানে সাহিত্যের বদলে চিত্রভাষার সাহায্য নিতে হয়। সেই কারণেই অপু-দুর্গার প্রথম দেখা ট্রেন চলে শুধু মাঠের মধ্যে দিয়ে নয়—কাশে ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে ; সেই কারণেই দুর্গা যখন ইন্দিরের নির্জীব দেহ দেখে পিছিয়ে যায়, তার পায়ে লেগে আমাদের খুব চেনা ইন্দিরের কাঁসার ঘটিটি হঠাৎ সজীব হয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ডোবার মধ্যে ; সেই কারণেই অপু তার দিদির চুরি করা পুঁতির মালা বাঁশ বনে ফেলে না (যেমন আছে উপন্যাসে), ফেলে পুকুরে, যার ফলে পানার আবরণে যে ফাঁকটি হয়, দুর্গার জীবনের একমাত্র অপ্রিয় ঘটনাকে গোপনের জন্যই যেন সেটি আবার বন্ধ হয়ে যায়।

আমার প্রথম চার পাঁচটি ছবির প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই বলা চলে যে সেগুলি সব ছিল সহজ গল্প সোজা করে বলা। এসব ছবিতে ভাষাগত গুণ থাকলেও, আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বিশেষ ছিল না। সেদিক দিয়ে প্রথম ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে আমার প্রথম স্বরচিত কাহিনীর ভিত্তিতে তোলা ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘা। শুধু কাহিনী নয়, সম্পূর্ণ স্বরচিত সংলাপের ব্যবহারও কাঞ্চনজঙ্ঘাতেই প্রথম। মনে আছে পথের পাঁচালি-র সময় বিভূতিভূষণের সংলাপ এক চুল এদিক ওদিক করতে দ্বিধা হত। কানুবাবু একবার 'লুচি-মোহনভোগ' বলতে গিয়ে পর পর আটবার শট নষ্ট করেন 'লুচি-মোহনবাগান' বলে। আজকে এমন ঘটনা ঘটলে দুবার হোঁচটের পর তৃতীয়বারের বার নির্দ্বিধায় সংলাপ বদলে 'লুচি-হালুয়া' বা 'লুচি-সন্দেশ' করে দিতাম। মূল উপন্যাসের সংলাপের প্রতি আনুগত্যের ভাব কাটিয়ে তার জায়গায় নিজে সাহস করে চলচিত্রোপযোগী সংলাপ রচনা করতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

দর্শকের সঙ্গে বসে ছবি দেখে বুঝেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা চলার ছবি নয়, কারণ দর্শক কেন্দ্রস্থ চরিত্র হিসাবে একটি গোটা পরিবারকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয়। অথচ আমি বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম এই চৌধুরী পরিবারের আটটি ও তাদের ঘিরে আরো চার-পাঁচটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বুনতে, এবং দেড়ঘন্টা ব্যাপী এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই সব চরিত্রের ব্যক্তিগত সমস্যার উপস্থাপন ও সমাধানে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাঠামো ছিল একেবারেই চলচ্চিত্রের কাঠামো—যেটা আমার আগের কোনো ছবি সম্বন্ধেই বলা চলে না।

কাঞ্চনজঙ্ঘার তিন বছর ও দুটি ছবির পরে তোলা চারুলতা-তে আমার মতে আমার প্রথম দশ-বারো বছরের কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। ছবির নানান দিকে নানান স্তরে এই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাবে, এবং সেটা শুধু আমার কাজেই নয়, আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সকলের কাজেই।

ছবির গোড়ার দিকের সামান্য বিষণ্ণতার সুর কেটে যায় মন্দা ও অমলের আসার

সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর গল্প কিছুক্ষণ চলে হালকা মেজাজে, এবং তার পরেই এক মিশ্র মেজাজের আভাস পাওয়া যায়, যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় একটি বিশেষ দৃশ্যে। এ ধরনের মিশ্র রসের অবতারণা আমার ছবিতে এই প্রথম, তাই এই দৃশ্যটির বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন।

অমল তার বৌঠানের কাছে 'আমি চিনি গো চিনি' গানটি গেয়েছে সবেমাত্র। অমলের প্রতি চারু এখন প্রসন্ন, কারণ সে জেনেছে অমল বিয়ের জন্য আদৌ ব্যগ্র নয়। চারু অমলের পুরোনো চটি জোড়া নিয়ে গেছে নিজের ঘরে ; তার বদলে সে অমলকে দেবে নিজের হাতে নকশা করা চটি, যেটা সে তৈরি করেছিল তার স্বামীর জন্য। ঠিক এই সময় অমল খবর পায় যে সরোরুহ পত্রিকা তার লেখা ছাপতে রাজী হয়েছে। খবরটা সে প্রথমে দিতে যায় মন্দার কাছে, কারণ মন্দাকে সে কথা দিয়েছে এই বিশেষ পত্রিকাটি তার লেখা ছাপলে সে মন্দাকে কুল্‌পি খাওয়াবে। চারু সবেমাত্র নতুন চটি জোড়াটি বার করেছে, এমন সময় শোনা যায় অমলের উল্লসিত ঘোষণা—'মন্দা বৌঠান! সরোরুহ্ আমার লেখা ছাপছে!' চারুর কাছে এটা বজ্রপাতের সামিল। সে জানে এর পরেই অমল তার কাছে আসবে, সে পথ সে বন্ধ করে দেয় দরজায় খিল দিয়ে। অমলের করাঘাতে চারু অটল। বাইরে অমল-মন্দার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়, দুজনে একসঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। দরজায় আবার করাঘাত পড়ে—কিন্তু এবার অমল নয়, ভূপতি। উদ্‌ভ্রান্ত চারু চোখের জল মুছে হাতে ঝাঁটা নিয়ে দরজা খোলে ; বলে, আরশোলা পালিয়ে যাবে, তাই দরজা বন্ধ। সরল ভূপতি চারুর কথা বিশ্বাস ক'রে নিজেই দরজা ভেজিয়ে দেয়, চারুকে তার সদ্যমুদ্রিত পত্রিকার গন্ধ শুঁকিয়ে দিয়ে চলে যায়। এবার অমল আসে কুল্‌পি নিয়ে। বৌঠান গোসা করেছে, তার মানভঞ্জনের জন্য তাকেই প্রথম দিতে যায় কুল্‌পি, চারু জানায় সে খাবে না। বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো মন্দা এই অবস্থায় কুল্‌পি গ্রহণ ক'রে আর জল ঘোলা করতে চায় না, তাই সে বলে, সেও খাবে না—'আমার দাঁত সিরসির করে'। কুল্‌পি শেষ পর্যন্ত যায় ফুলোর পেটে।

চারটি চরিত্র নিয়ে পাঁচসাত মিনিটের একটি দৃশ্যে এই ধরনের বিপরীত রসের সমাবেশ আমার এর আগের বা পরের কোনো ছবিতেই নেই।

চলচ্চিত্রের ভাষা যেখানে দৃশ্য ধ্বনি সংলাপ সংগীত সব কিছুরই সাহায্য নিতে পারছে, এবং চলচ্চিত্র যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে বাঁধা, সেখানে পরিচালকের একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কত অল্প সময়ে, কত সাবলীল ও চিত্তাকর্ষকভাবে তার বক্তব্য পেশ করা যায়। এটা সব সময়েই মনে রাখতে হয় যে সোজাসুজি মুখে বললে বক্তব্য অনেক সময় মোটেই জোরদার হয় না। নষ্টনীড় গল্পের শেষ কথা ছিল ভূপতির চারুকে মহীশূর নিয়ে যাবার অনুরোধে চারুর উত্তর—'না থাক'। গল্পের এই 'থাক' কথাটির মধ্যে এক অমোঘ ইঙ্গিত আছে যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এখনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। কিন্তু এই একটিমাত্র মুখে বলা কথা যে ছবির পরিসমাপ্তি হিসেবে যথেষ্ট জোরদার হ'ত না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়ে অনেক চিন্তার পর স্বামী-স্ত্রী হাতে হাত না মেলার ফ্রীজ শটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

বক্তব্য সরাসরি কথায় না বলে আকারে ইঙ্গিতে কী ভাবে বলা যায় তার একটা

উদাহরণ আছে আমার দশ বছর আগের ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে। চিত্রভাষার দিক দিয়ে আমার মতে অরণ্যের দিনরাত্রি আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি, যদিও এ ছবি এদেশে বিশেষ সমাদর পায়নি।

ছবির মধ্যপর্বে, যখন কাহিনীর সব ক'টি চরিত্রেরই অন্তত বাইরের দিকটা আমরা চিনে ফেলেছি, তখন আসে 'মেমরি-গেম' খেলার দৃশ্যটি। ছ'টি চরিত্র তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো প্রায় তাদের অজান্তেই গড়ে উঠেছে, সেই সম্পর্ক তাদের কাকে কোনদিকে নিয়ে যাবে, তার আভাস দেওয়া হয়েছে এই খেলার দৃশ্যে। এখানে কোনো কিছুই খুলে বলা হয়নি, এবং কোনো সময়ই খেলা থামেনি, অথচ শেষপর্যন্ত খেলা গৌণ হয়ে গিয়ে চরিত্রগুলির আচরণের ইঙ্গিতময়তাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খেলাচ্ছলে চরিত্র উদ্ঘাটনের এই দৃশ্য আমার নিজের একটি প্রিয় দৃশ্য। দৃশ্যের আপাতলঘু মেজাজের পশ্চাতে যে অনেক চিন্তা, অনেক হিসাব রয়েছে, এটা রচয়িতা হিসাবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এই হিসাবের দিকটা, মননের দিকটা, যদি দর্শকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায়, তাহলেই চিত্রভাষা সার্থক। এই সার্থকতা বিনা অনুশীলনে লভ্য নয়।

পঁচিশ বছর ছবির কাজ করে অন্তত এটুকু প্রত্যয় হয়েছে যে ভালো গল্প পেলে বা মাথায় এলে তাকে চলচ্চিত্রের ছাঁচে ঢেলে গুছিয়ে বলতে পারব। বাস্তবধর্মী ছবি, ফ্যাণ্টাসি ছবি, বড়দের ছবি, ছোটদের ছবি, হাসির ছবি, দুঃখের ছবি, অতীতের ছবি আজকের ছবি—এ সবই করার সুযোগ হয়েছে এই পঁচিশ বছরে। অন্য শিল্পের মতোই, চলচ্চিত্রে শেখার কোনো শেষ নেই। নতুন জাতের কাহিনী হলেই তার জন্য নতুন আঙ্গিকের, নতুন চিত্রভাষার প্রয়োজন হবে। সে ভাষা যদি তৈরি না থাকে তো তাকে গড়ে নিতে হবে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

এ সবই সম্ভব। কিন্তু অবস্থানিরপেক্ষভাবে নয়। অভিজ্ঞ পরিচালককেও যে অনেক সময় গতানুগতিকের পথে চলতে হয় সেটা অনেকটাই অবস্থার চাপে।

ষাট দশকের মাঝামাঝি এমন একটা অবস্থা এসেছিল যখন মনে হয়েছিল একজন প্রতিষ্ঠাবান সৃজনশীল পরিচালকের পক্ষে কাজের সুযোগের অভাব হবার কোনো কারণ নেই; নতুন বিষয় নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে কোনো বাধা নেই। কিন্তু গত বছর পাঁচেক থেকেই একটা ধারণা মনে দানা বাঁধছিল যে এই অবস্থা বেশি দিন টেকার নয়।

গত কয়েক বছরে চিত্র নির্মাণের খরচ বেড়েছে মারাত্মক ভাবে। সেইসঙ্গে নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতির অভাবে, স্টুডিও ল্যাবরেটরী প্রেক্ষাগৃহগুলির দৈন্যদশায়, হিন্দি ছবির প্রভাবে দর্শকদের রুচি বিকৃতির ফলে এবং লোড শেডিং-এর দৌরাত্ম্যে বাংলা ছবি আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এই পঁচিশ বছরে যা শিখলাম সেটা কাজে লাগানোর সুযোগ আর কতদিন থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

আনন্দলোক, পূজাবার্ষিকী: ১৯৮০

চিত্রশিল্পী সংগীতগুণী প্রচারবিদ্ বাগ্মী এবং বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়ই সমান দক্ষ লেখক সত্যজিৎ রায়ের প্রধান পরিচয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুক্তিদাতা তিনি। আর তাঁর চিত্রের মুক্তি ভারতীয় সংস্কৃতি-সরণীর এক-একটি মাইলস্টোন, বিশ্বের মানচিত্রেও সগর্ব অধ্যায়। সাধনা তাঁর নিষ্ঠাবান, যাত্রা তাঁর নিঃসঙ্গ, শিল্পরুচি সৃষ্টিতে যিনি নিজেকেই অতিক্রম করেছেন। সেই চলচ্চিত্রনির্মাণে চিত্রনাট্য-সংলাপ-রূপসজ্জা থেকে শুরু করে সম্পাদনা-বিজ্ঞাপন-প্রচারে সত্যজিৎ রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁর সেই দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে এই গ্রন্থের রচনাবলীতে : চলচ্চিত্রের সমালোচনা রয়েছে, রয়েছে সংগীতের ব্যবহার বা সম্পাদনার পদ্ধতি এমনকি চিত্রকেন্দ্রিক বিষণ্ণ মধুর স্মৃতিচর্যা। স্বচ্ছ ভাবনার দীপ্তিমান প্রকাশে এই গ্রন্থ চলচ্চিত্র-জিজ্ঞাসু তথা যে-কোনো শিল্পপ্রেমী বাংলাভাষীর অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

৬০.০০

9 788170 666226